মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্তা

নবপর্যায় : ৩য় বর্ষ, একাদশ সংখ্যা, এপ্রিল ২০২৩

‘মুছে যাক গ্লানি ঘুচে যাক জরা
অগ্নিস্নানে শুচি হোক ধরা’

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সুহৃদ ও শুভানুধ্যায়ীদের জানাই নববর্ষ ও ঈদুল ফিতরের শুভেচ্ছা

২২ মার্চ ২০২৩

২৭ বছরের পথচলায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ২৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে গত ২২ মার্চ ২০২৩, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর মিলনায়তনে আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ও সদস্য সচিব সারা যাকের, ট্রাস্টি ডা. সারওয়ার আলী ও মফিদুল হকের উপস্থিতে স্মারক বক্তৃতা প্রদান করেন বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্ণর ও ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য এবং প্রধান উপদেষ্টা ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন।

ট্রাস্টি ডা. সারওয়ার আলী তার স্বাগত বক্তব্যে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রতিষ্ঠা লগ্নের স্মৃতি রোমন্থন করে বলেন, ‘আজ থেকে ২৭ বছর আগে ১৯৯৬ সালের এক ঝড়ো বিকেলে সেগুনবাগিচার ভাড়া বাড়িতে আমরা আটজন সাধারণ নাগরিকের উদ্দ্যোগে এই জাদুঘরের যাত্রা শুরু হয়েছিল। আজ ২৭ বছরে এই বৃহৎ অট্টালিকায় জাদুঘর স্থানান্তরিত হয়েছে। গড়ে উঠেছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সর্ববৃহৎ সংগ্রহশালা। দেশ ও বিদেশে সমাদৃত তথ্য ভাণ্ডার’।

তিনি তার বক্তব্যে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে জীবন্ত রাখতে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের গৃহীত নানা কার্যক্রমের কথা উল্লেখ করেন। গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায়ে বাংলাদেশ সরকারকে সহায়তা করার কথাও উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের বিপুল কর্মযজ্ঞ সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে সর্বজনের সহযোগিতায়’ তিনি বলেন, ‘বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে সাড়া দিয়ে সারা দেশের মানুষ জনযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে বিজয় অর্জন করেছিল। একইভাবে সর্বজনের সহায়তায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর জনগণের মাধ্যমে জনগণের জাদুঘরে পরিণত হয়েছে’।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরকে স্বনির্ভর করে গড়ে তোলার প্রতিবন্ধকতাসমূহ উল্লেখ করে তিনি মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি সংরক্ষণে আগ্রহী সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সম্মিলিত প্রচেষ্টার প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করেন। পরিশেষে তিনি দেশ ও সমাজ যেন মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধ থেকে পথভ্রষ্ট না হয় সে বিষয়ে সকলকে সচতেন থাকার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ করেন ট্রাস্টি ও সদস্য সচিব সারা যাকের। বক্তৃতার শুরুতে তিনি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সাথে সম্পৃক্ত সকলকে তাদের সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানান। ভবিষ্যৎ জাদুঘর পরিচালনার দিকে দৃষ্টি রেখে তিনি জাদুঘরের একটি স্থায়ী তহবিল গড়ে তোলার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন এবং এ বিষয়ে সবার কাছে সহায়তা আহ্বান করেন।

তিনি তার প্রতিবেদনে মুক্তিযুদ্ধ জদুঘরের বিভিন্ন কার্যক্রম ও সফলতা তুলে ধরেন। বায়ান্ন হাজারের বেশি প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষ্য মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের আর্কাইভে সংরক্ষিত রয়েছে। বিগত বছরে ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর নয়টি জেলায় ১২৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মসূচি পরিচালনা করেছে। বিশ্বজুড়ে সংঘটিত গণহত্যার কারণ অনুসন্ধান, তার প্রতিকার ও পুনর্বাসন বিষয়ে গভীরভাবে কাজ করার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিচালিত সেন্টার ফর দি স্ট্যাডি অব জেনোসাইড অ্যান্ড জাস্টিস (সিএসজিজে)।

এছাড়া তিনি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের হিসাবও তুলে ধরেন।

প্রতি বছর মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে জাতীয় - আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তি স্মারক বক্তৃতা প্রদান করেন। সে ধারাবাহিকতায় এবারের অনুষ্ঠানে স্মারক বক্তৃতা প্রদান করেন বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ও ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য এবং প্রধান উপদেষ্টা ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন।

৭-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

রঙ ও রেখায় রঙিন পথ

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ২৭ বছরের পথ চলায় নানা শ্রেণি পেশার মানুষ নানাভাবে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছেন। এর ধারাবাহিকতায় বিগত কয়েক বছর ধরে যুক্ত হয়েছে ইউনিভার্সিটি অব ডেভেলপমেন্ট অলটারনেটিভ (ইউডা)-র চারুকলা বিভাগের শিক্ষার্থীরা। জাদুঘরের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর আগের দিন সন্ধ্যায় তারা জাদুঘর সংলগ্ন তিনপাশের রাস্তা আলপনার রঙে রাঙিয়ে জাদুঘরের সাথে একাত্ম হয়ে পুরানো বছরকে বিদায় জানায়।

রাজপথে রঙিন আল্পনা অঙ্কন এই আয়োজনে উপস্থিত ছিলেন ইউডা-র চারুকলা বিভাগের শিক্ষক, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সুহৃদ শাহজাহান আহমেদ বিকাশ। তিনি বলেন, ‘ইউডার চারুকলা বিভাগ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সাথে বরাবরই সম্পৃক্ত থাকে এবং যারা মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সাথে সম্পৃক্ত আছেন, তারা প্রত্যেকেই মুক্তিযুদ্ধের সাথে সম্পৃক্ত আছেন বলে আমরা মনে করি’।

এই আয়োজনে আরো উপস্থিত ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা মহসিন। ২৭ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে

৭-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

বাংলাদেশ মিশন এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের যৌথ আয়োজন

প্রথমবারের মতো জাতিসংঘ সদর দফতরে একাত্তরের গণহত্যার আলোকচিত্র প্রদর্শনী

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মাটিতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর চালানো বর্বরোচিত গণহত্যার ওপর প্রথম-বারের মতো জাতিসংঘ সদর দফতরে আলোকচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সহযোগিতায় এই প্রদর্শনীর আয়োজন করে জাতিসংঘে দায়িত্বরত বাংলাদেশের স্থায়ী মিশন।

প্রদর্শনীটি ২৯ মার্চ ২০২৩ আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন। এসময় জাতিসংঘে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত ও স্থায়ী প্রতিনিধি, জাতিসংঘের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, নিউইয়র্কে বসবাসরত প্রবাসী বীর মুক্তিযোদ্ধা, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, মিডিয়া কর্মী ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

পররাষ্ট্র সচিব বলেন, জাতিসংঘ সদর দফতরে আয়োজিত এই প্রদর্শনী ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে সংঘটিত গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমাদের অব্যাহত প্রচেষ্টাকে তরান্বিত করার ক্ষেত্রে একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। তিনি এই প্রদর্শনীটি সফলভাবে আয়োজন করতে আন্তরিকভাবে সহায়তার জন্য মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরকে বিশেষ ধন্যবাদ জানান।

এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিভিন্ন দেশের কূটনীতিক, মিডিয়া ব্যক্তিত্ব এবং সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের ধন্যবাদ জানিয়ে জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি ও রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ আব্দুল মুহিত বলেন, আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং গণহত্যার ইতিহাস আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মাঝে গভীরভাবে ছড়িয়ে দিতে আমাদের আরও জোর প্রচেষ্টা চালানো দরকার। এই প্রদর্শনী কেবল আমাদের ১৯৭১ সালের গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায় করতে সহায়তা করবে না, আগামী দিনগুলোতে বিশ্বব্যাপী গণহত্যা এবং অন্যান্য নৃশংস অপরাধ রোধের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সবার মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ২৭টি আলোকচিত্রের সমন্বয়ে ১৯৭১ সালের গণহত্যার ওপর এক উপাখ্যান উপস্থাপন করে এই প্রদর্শনীতে।

বাংলাদেশ গণহত্যা স্মরণ দিবস : আন্তর্জাতিক বক্তা প্যাট্রিক বার্জেস

১৯৭১ সালের নির্মম গণহত্যার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ২০১৭ সালে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে ২৫শে মার্চকে জাতীয় গণহত্যা দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয় । এই দিবসের স্মরণে প্রতি বছরের ন্যায় এবারও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর যৌথভাবে ২৫শে মার্চ ২০২৩ সকাল ১০টায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রধান মিলনায়তনে একটি বিশেষ আলোচনাসভার ও বিশেষ বক্তৃতার আয়োজন করে। এই অনুষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব এ.কে.এম. মোজাম্মেল হক এমপি; পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মো. শাহরিয়ার আলম এমপি এবং সাবেক মন্ত্রী ও বীর মুক্তিযোদ্ধা শাজাহান খান এমপি উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পররাষ্ট্র সচিব রাষ্ট্রদূত মাসুদ বিন মোমেন, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব রঞ্জিত কুমার দাস এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক। 'বাংলাদেশ গণহত্যা এবং বৈশ্বিক সম্প্রদায়: তখন এবং এখন' বিষয়ে স্মারক বক্তৃতা দেন এশিয়া জাস্টিস এন্ড রাইটসের সভাপতি প্যাট্রিক বার্জেস।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন পররাষ্ট্র সচিব রাষ্ট্রদূত মাসুদ বিন মোমেন। তিনি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীনতার মহান স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, মহান মুক্তিযুদ্ধের ত্রিশ লাখ শহীদ, দুই লক্ষাধিক নির্যাতন ও ধর্ষণের শিকার মা-বোন এবং সব বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। স্বাগত বক্তব্যে তিনি বাংলাদেশের গণহত্যা সম্পর্কে পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে জ্ঞান ছড়িয়ে দেয়ার বিষয়ে স্মার্ট এবং টেকসই উপায় খুঁজে বের করার প্রতি মনোযোগ দেয়ার আহ্বান জানান। তিনি বৃহত্তর বিশ্ব সম্প্রদায়ের দ্বারা বাংলাদেশের গণহত্যাকে স্বীকৃতি দেয়ার ক্ষেত্রে গণমাধ্যম, সুশীল সমাজ, গণহত্যা বিশেষজ্ঞ এবং মানবাধিকার কর্মীদের ভূমিকাও তুলে ধরেন।

এরপর গণহত্যা অধ্যয়ন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় মূল বক্তা প্যাট্রিক বার্জেসের অবদান তুলে ধরেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক। প্যাট্রিক বার্জেস তার বক্তব্যে বলেন যে, ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী কর্তৃক যৌন নির্যাতনের শিকার নারীদের বীরাঙ্গনা হিসেবে সম্মানিত করে বঙ্গবন্ধু সরকার একটি সাহসী ও প্রশংসনীয় পদক্ষেপ নিয়েছিল। এছাড়াও তিনি ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের গণহত্যা সম্পর্কে সত্য উদ্ঘাটনের আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া এবং ক্রান্তিকালীন ন্যায় বিচার নিশ্চিত করার স্বার্থে গণহত্যা বিষয়ক আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠাকে বাংলাদেশ সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে উল্লেখ করে প্রশংসা করেন। দ্রুততার সাথে রোহিঙ্গা গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির উদাহরণ টেনে তিনি বলেন যে, একাত্তরের গণহত্যার স্বীকৃতির বিষয়ে এখনো শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে একধরনের বিপরীত আচরণ লক্ষণীয়।

এরপর পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মো. শাহরিয়ার আলম এমপি তার বক্তব্যে বলেন, পরিকল্পিতভাবে তৎকালীন পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাঙালিদের স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক, ভাষাগত সব উপায়ে ধ্বংস করার সুস্পষ্ট অভিপ্রায়ে গণহত্যা চালিয়েছিল। তিনি দায়-মুক্তির সংস্কৃতির অবসান ঘটাতে কঠোর ভূ-রাজনৈতিক বাস্তবতা সত্ত্বেও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং পরবর্তীকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার যেসব উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন সেগুলোর গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি আফসোস করেন যে, গণহত্যাকারীদের প্রতি সহানুভূতিশীলরা তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করেছিল। তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় অনেক দেশ পাকিস্তানকে সমর্থন করেছিল এবং এই দেশগুলো এখনো বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ অনেক বিষয়ে কথা বলার চেষ্টা করে। তাদের উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, ওই দেশগুলো ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের গণহত্যার স্বীকৃতির জন্য কোনোরকম পদক্ষেপ না নিলেও তারা মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে চলমান ঘটনাকে গণহত্যা বলে অভিহিত করেছে। বাংলাদেশের গণহত্যা যাতে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পায় সেজন্য তিনি তাদের অগ্রণী ভূমিকা পালনের আহ্বান জানান। যে ভূ-রাজনীতি গণহত্যার অপরাধীদের উৎসাহিত করেছে এবং মুক্তিযুদ্ধের গতিপথকে বারবার রোধ করার চেষ্টা করেছে- তা এখনো বাংলাদেশের গণহত্যার স্বীকৃতির পথে একটি বড় সংকট বলে তিনি উল্লেখ করেন।

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ.ক.ম. মোজাম্মেল হক এমপি তার বক্তব্যে মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন এবং ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় তৎকালীন পাকিস্তানি শাসকদের বাংলাদেশে গণহত্যা চালানোর উদ্দেশ্য বিষয়ে আলোকপাত করেন। তিনি আরও বলেন যে, মার্কিন সরকার বাংলাদেশের বিপক্ষে থাকলেও মুক্তিযুদ্ধের সময় এসব দেশের নাগরিকরা বাংলাদেশের পক্ষে ছিল। বাংলাদেশে গণহত্যার স্বীকৃতি আদায়ে সরকার তার কূটনৈতিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে বলে জানান তিনি।

এছাড়াও উক্ত অনুষ্ঠানে বিশেষ বক্তব্য রাখেন বীর মুক্তিযোদ্ধা শাজাহান খান এমপি। এরপর '১৯৭১ সালের বাংলাদেশ গণহত্যা: যুবসমাজের অনুধাবন' বিষয়ক পোস্টার উপস্থাপনের জন্য বিজয়ী তিনজনকে পুরস্কার প্রদান করা হয়। মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব রঞ্জিত কুমার দাসের ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি শেষ হয়। পরিশেষে আমন্ত্রিত অতিথিরা "গণহত্যার স্মরণ ও স্বীকৃতি" নামক বিশেষ প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন।

নুসাইবা জাহান, গবেষণা সহকারী,
সেন্টার ফর দ্য স্টাডি অব জেনোসাইড এন্ড জাস্টিস

সিএসজিজে মাসিক বক্তৃতামালা : অধ্যাপক কাবেরী গায়েন

মার্কিন টেলিভিশন সংবাদে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ১৯৭১

গত ৩১ মার্চ সেন্টার ফর দ্য স্টাডি অব জেনোসাইড এন্ড জাস্টিস (সিএসজিজে)-এর আয়োজনে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সেমিনার কক্ষে মাসিক বক্তৃতামালার অষ্টম পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। এই পর্বে 'মার্কিন টেলিভিশনের সংবাদে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ১৯৭১' বিষয়ে বক্তব্য রাখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক ড. কাবেরী গায়েন। স্বাগত বক্তব্যের মাধ্যমে সভায় উপস্থিত সকলকে অভ্যর্থনা জানান মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি এবং সিএসজিজের পরিচালক মফিদুল হক।

ড. কাবেরী গায়েন তার বক্তৃতায় আলোচনা করেন, মিডিয়া এবং যুদ্ধের মধ্যকার সম্পর্ক নিয়ে, দক্ষিণ এশিয়া সংক্রান্ত মার্কিন পররাষ্ট্র-নীতি এবং কীভাবে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে মার্কিন টেলিভিশনগুলো পাকিস্তানের পক্ষাবলম্বন করে সে বিষয়ে। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন মার্কিন টেলিভিশনগুলোর প্রচারিত সংবাদগুলোর উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন, গণহত্যা সংঘটনে মার্কিন সরকার যখন পাকিস্তানকে অস্ত্র সরবরাহ করে সহায়তা করছিল, তখন মার্কিন টেলিভিশন চ্যানেলগুলো বাঙালিদের বিরুদ্ধে নেওয়া পাকিস্তানের পদক্ষেপগুলোর পক্ষে প্রচারণা চালাচ্ছিল। সংখ্যায় কম হলেও সেসময় প্রিন্ট মিডিয়ার কিছু কভারেজ থাকলেও টেলিভিশন মিডিয়ার কোনো কভারেজ ছিলো না বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে।

তিনি বিভিন্ন পরিসংখ্যানের পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন মিডিয়ার তিনটি পর্যায় নিয়ে কথা বলেন। যা ছিলো, মার্চ থেকে মে ১৯৭১ যেখানে কৌশলগত স্বার্থে মার্কিন টেলিভিশন সংবাদে মুক্তিযুদ্ধকে একটি গৃহযুদ্ধ হিসেবে প্রচার চালানো হয়। বেশিরভাগ সাংবাদিক এবং সংবাদ নেটওয়ার্ক পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং প্রতিরোধ যুদ্ধ সম্পর্কে কিছুটা নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছিল।

দ্বিতীয় পর্যায়ে জুন থেকে সেপ্টেম্বরে টেলিভিশন সংবাদে প্রকাশ করা হয় শরণার্থী সংকটের মতো মানবিক সমস্যা সম্পর্কে। বেশিরভাগ প্রতিবেদনই ভারত থেকে রিপোর্ট করা হয়। বেশিরভাগ সাংবাদিকই ভারতভিত্তিক হয়ে ওঠে এবং আংশিকভাবে শরণার্থী শিবিরগুলো কভার করে, কারণ পাকিস্তান সরকার তখন পূর্ব পাকিস্তান থেকে বিদেশী সাংবাদিকদের রিপোর্টিং সীমাবদ্ধ করে দেয়। এছাড়াও বর্ষাকালে সীমান্ত সংলগ্ন অঞ্চলগুলোতে নিরাপদে যোগাযোগ করা কঠিন হয়ে উঠে।

শেষ পর্যায়ে অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর মাসের প্রতিবেদনে প্রচার করা হয় যে, ভারত যুদ্ধে প্রবেশ করেছে এবং যুদ্ধ শেষে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় হয়েছে। বেশিরভাগ সাংবাদিকই তখন ইতিবাচক হয়ে ওঠে বাংলাদেশ সম্পর্কে। জোরালোভাবে ভারতীয় সেনাবাহিনীর আধিপত্যের প্রতিবেদন করে এবং একইসাথে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ভূমিকা এবং পশ্চিম পাকিস্তান সেনাবাহিনীর দ্বারা সংঘটিত নৃশংসতার উপর জোর দেয়।

ড. কাবেরী গায়েন আরো বলেন, মার্কিন মিডিয়া মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন বিভিন্ন ছবি এবং ফুটেজকে ভুলভাবে ব্যাখ্যা করতো। তার মতে, যদিও বাংলাদেশ যুদ্ধ নিয়ে প্রায়শই রিপোর্ট করা হত, তবে যুদ্ধের প্রতিবেদন অন্যান্য সংবাদ আইটেমের তুলনায় দৈর্ঘ্যে অনেক ছোট ছিল। তার মতে, মার্কিন টেলিভিশন সংবাদগুলো বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যায় যে, ১৯৭১ সালে পাকিস্তান নিরস্ত্র বাঙালিদের উপর পদ্ধতিগতভাবে গণহত্যা চালিয়েছিল। তার আলোচনা শেষে তিনি এও বলেন যে, বাংলাদেশের এখনই উচিত আমেরিকাসহ বিভিন্ন দেশের এইধরনের দুর্লভ অডিও-ভিডিও সংবাদ ফুটেজগুলো সংগ্রহ করে নিজস্ব আর্কাইভ তৈরি করা, যাতে গবেষকরা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কাজ করতে পারে। সবশেষে প্রশ্ন-উত্তর পর্বের মাধ্যমে শেষ হয় মাসিক বক্তৃতামালার অষ্টম পর্ব।

জাহিদ-উল ইসলাম
গবেষণা সহকারী, সিএসজিজে

বিশেষ কর্মশালা

আন্তর্জাতিক আইন এবং বিচার

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সেন্টার ফর দ্য স্টাডি অব জেনোসাইড এন্ড জাস্টিস (সিএসজিজে) গত ১৫-১৬ মার্চ ২০২৩ তারিখে 'আন্তর্জাতিক আইন এবং বিচার' শীর্ষক বিশেষ কর্মশালার আয়োজন করে। দুই দিনব্যাপী এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর পর্যায়ের বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষার্থীরা।

কর্মশালা পরিচালনা করেন বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী এবং জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সদস্য কাওসার আহমেদ, আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির আইন বিভাগের প্রভাষক কাজী ওমর ফয়সাল এবং বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালসের আইন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ও সিএসজিজের সমন্বয়ক ইমরান আজাদ। তারা আন্তর্জাতিক আইনের ধারণা, উৎস, আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে রাষ্ট্রের পাশাপাশি ব্যক্তিদের দায়-দায়িত্ব, আন্তর্জাতিক আদালত হিসেবে আইসিজে, আইসিসি ও ইউনিভার্সাল/রিজিয়নাল হিউম্যান রাইটস্ মেকানিজমগুলোর কর্মধারাসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। প্রতিটি সেশন শেষে কর্মশালায় অংশ নেওয়া শিক্ষার্থীরা দলগত এক্সসারসাইজে অংশগ্রহণ করেন এবং বর্তমানে অমীমাংসিত আন্তর্জাতিক আইনের বিষয়গুলো নিয়ে তাদের অভিমত সকলের সামনে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে উপস্থাপন করেন।

কর্মশালায় সনদ বিতরণ অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মিয়ানমার উইংয়ের মহাপরিচালক মিয়া মো. মইনুল কবীর এবং সিএসজিজের পরিচালক ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের অন্যতম ট্রাস্টি মফিদুল হক। মিয়া মো. মইনুল কবীর তার বক্তব্যে রোহিঙ্গা সংকট নিরসনে বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন আন্তর্জাতিক পদক্ষেপের বিষয়ে কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের ধারণা দেন। সনদ বিতরণের মধ্য দিয়ে কর্মশালা শেষ হয়।

মেহজাবিন নাজরানা, গবেষণা সহকারী, সিএসজিজে

গণহত্যা দিবস স্মরণে বিশেষ প্রদর্শনী

২৫ মার্চ গণহত্যা দিবস উপলক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ভাস্কর্য চত্বরে 'গণহত্যার স্মরণ ও স্বীকৃতি' শীর্ষক বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ.ক.ম মোজ্জামেল হক এমপি এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। এ সময় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম, শাজাহান খান এমপি, আন্তর্জাতিক মানবাধিকারকর্মী প্যাট্রিক বার্জেস, পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হকসহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।

২৫ মার্চ থেকে ৩১ মার্চ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত বিশেষ এই প্রদর্শনীতে ৩৭টি আলোকচিত্র, ৮টি ডকুমেন্ট, ১টি পোস্টার, ১৪টি ম্যাগাজিন ও পত্রিকার মাধ্যমে ৪৭ এর দেশভাগ থেকে শুরু করে ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, সত্তরের নির্বাচন, বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ, অসহযোগ আন্দোলন, বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা, ২৫ মার্চ কালরাত্রির গণহত্যা, মুজিবনগর সরকার গঠন, রাজাকার ও সামরিক জান্তার সহযোগী স্থানীয় ধর্মান্ধ দালালগোষ্ঠীর তৎপরতা, শরণার্থী শিবির, মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিরোধ, আন্তর্জাতিক সমর্থন, নারী নির্যাতন, বুদ্ধিজীবী হত্যা, বিজয়, বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন, যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য বঙ্গবন্ধুর গৃহীত পদক্ষেপ, গণহত্যার অপরাধে অভিযুক্ত ১৯৫ জন যুদ্ধবন্দীকে মুক্তি দিতে আর্ন্তজাতিক চাপ, আর্ন্তজাতিক অপরাধ ট্রাইবুন্যাল গঠনের মাধ্যমে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার, যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবীতে তরুণ প্রজন্মের স্বর্তঃস্ফূর্ত জাগরণ, ২৫ মার্চ গণহত্যাকে জাতীয় সংসদে স্বীকৃতি প্রদানসহ মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন দিক এই প্রদর্শনীতে উঠে এসেছে। গণহত্যা দিবস স্মরণে নিউইয়র্কস্থ জাতিসংঘ সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত বিশেষ প্রদর্শনীর বাংলা ভাষ্য নিয়ে আয়োজিত হয়েছে এই প্রদর্শনী। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় গণহত্যা দিবস স্মরণে বিশেষ এই প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর।

আর্কাইভ ও ডিসপ্লে বিভাগ, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

স্বাধীনতা দিবসে অদম্য পদযাত্রা : তারুণ্যের জোয়ার

২৬ শে মার্চ একটি নতুন সূর্যের জন্ম। রাতের অন্ধকার কাটিয়ে ফুটে উঠতে থাকে ভোরের নরম আলো। শহীদ মিনার চত্বর। আমাদের প্রাণ ফিরে পাওয়া প্রাঙ্গণ। সেই প্রাঙ্গণ জুড়ে প্রায় আকাশ ছুঁতে চাওয়া কিছু গাছ তখনও আলো-আঁধারিতে রহস্যময়ী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সেখানে আশ্রয় নেয়া কিছু পাখি কলকাকলিতে জাগিয়ে তুলছে ভোরের নীরবতাকে। একটি দুটি মানুষের মৃদু পায়ের শব্দ, শ্রদ্ধায় অবনত হৃদয়ের অঞ্জলি, বুকের অলিন্দে পুষে রাখা ভালোবাসা, কুশল বিনিময় করা অনুচ্চ স্বর শব্দেরা মিলেমিশে একাকার হতে থাকে সেই অনন্য ভোরের প্রাণময় হাওয়ায়। হাতে লাল সবুজের পতাকা প্রতি পদক্ষেপে এনে দেয় দৃঢ়তা, শহীদদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা।

চোখে দৃপ্ত প্রেরণা আর স্বপ্ন-সুন্দর একটি বাংলাদেশ। প্রতিবারের মতো এবারও মিলিত হয়েছি আমরা মার্চের অগ্নিঝরা শপথে বলীয়ান হতে। বাঙালির হৃদয়ের বাতি -ঘর শহীদ মিনার থেকে ঠিকানা সাভারের জাতীয় স্মৃতি সৌধ। ভোরের আলো আলিঙ্গন করছে সবাইকে। সে এক প্রাণের মেলা। সে-ই সকালে শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে কে নেই সে দলে! কোমলমতি শিশু থেকে ষাটোর্ধ প্রবীণ। মহান স্বাধীনতা দিবসে 'শোক থেকে শক্তি অদম্য পদযাত্রা' স্লোগানে পথ চলা। হাতে হাত রেখে অগ্নিঝরা মার্চের তপ্ত রোদ উপেক্ষা করে পায়ে পায়ে এগিয়ে চলা। প্রশ্ন জাগে কেন এই পদযাত্রা? নতুন প্রজন্মকে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করতে পর্বতারোহী সংগঠন অভি-যাত্রী ও মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘরের যৌথ আয়োজনে এই পদযাত্রা। সকাল ছ'টায় জাতীয় সঙ্গীত গেয়ে এবং ভাষা শহীদদের প্রতি সম্মান জানিয়ে শুরু হয় পদযাত্রা। এবার নিয়ে ১১ বছরে পড়লো এই পদযাত্রা। এ যাত্রায় ঢাকার বাইরে থেকে এসেও যুক্ত হন পদযাত্রীরা। আসে টাঙ্গাইল থেকে ভারতেশ্বরী হোমসের ছাত্রী-শিক্ষক। শহীদ মিনার থেকে যাত্রা শুরু করে পদযাত্রীরা প্রথমেই শ্রদ্ধা নিবেদন করে জগন্নাথ হলে ২৫শে মর্চের রাতে গণহত্যায় শহীদদের প্রতি। এরপর গণহত্যার শিকার ঐতিহাসিক কালীমন্দির, শিখাচিরন্তন ও মধুর ক্যান্টিনে শ্রদ্ধা জানিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে স্মৃতি চিরন্তন এরপর মোহাম্মদপুর কলেজ হয়ে রায়ের বাজার বধ্যভূমি পৌঁছে দলটি।

এরপর দীর্ঘ ৩২কিলোমিটার নৌকায় বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, ধলেশ্বরী ও বংশাই পাড়ি দিয়ে বংশাই শ্মশান ঘাট। তারপর আবার পায়ে হাঁটা, এ যেন ৭১-এ উদ্বাস্তু একদল শরণার্থী, একটি নিরাপদ আশ্রয় খোঁজা। গোপীনাথপুর, চারিগ্রামের নিভৃত গ্রামীণ পথ ধরে সন্ধ্যার মুখে পৌঁছে যাওয়া সাভারের জাতীয় স্মৃতি সৌধে।

এই যে দীর্ঘ পথ হাঁটা- এ যাত্রা কোনো প্রতিযোগিতার নয় এ এক পরম অনুভবের। শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধার, ভালোবাসার। এ যাত্রায় ক্লান্তিতে শ্রান্তিতে ভেঙে পড়ার কোনো লক্ষণই ছিল না কারো মধ্যে। প্রতিটি জায়-গায় যাত্রা বিরতি করে সে জায়গার ঘটে যাওয়া নির্মম ইতিহাস তুলে ধরা হয়। তরুণ প্রজন্ম জানতে পারে জন্মের ইতিহাস।

সন্ধ্যায় চারিদিক যখন মৌন, ঠিক সেই সময়ে শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে হাঁটুগেড়ে তারুণ্যের দৃপ্ত শপথ। শপথ বাক্য পাঠ করান এভারেস্ট জয়ী প্রথম বাংলাদেশি নারী নিশাত মজুমদার-

'হে আমাদের মহান অগ্রজেরা, তোমাদের উপর অর্পিত কর্তব্য তোমরা পালন করেছো অসীম সাহসিকতায়, বিরল ভালোবাসায় আর নিপুন নিষ্ঠায়। কর্তব্যের সময় এবার আমাদের...'

স্মৃতি সৌধের সামনে নবীন অভিযাত্রীরা দীপ্ত শপথ নিয়ে অপরিসীম এক মৌনতায় ধ্যনমগ্ন হয়। শহীদের রক্তের প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রতিজ্ঞায় দৃপ্ত এ দলে যুক্ত হচ্ছে প্রতিবছরই নতুন মুখ। আমরা আশাবাদী অদম্য পদযাত্রায় তারুণ্যের এ জোয়ার বাংলাদেশকে সমৃদ্ধ করবে দেশাত্মবোধ, মেধা-মনন, শিল্পবোধ, সংস্কৃতি, অর্থনীতি সম্প্রীতি, ও রুচিবোধে।

হেনা সুলতানা

স্বাধীনতার স্বপ্নধরা পদযাত্রা

ভিন্ন এক কর্মসূচির মাধ্যমে স্বাধী-নতা দিবস-২০২৩ উদযাপন করলো সোহাগ স্বপ্নধরা পাঠশালা। স্কুল প্রাঙ্গণ থেকে মিরপুর বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ পর্যন্ত প্রায় ৫ কিলোমিটার পথ পায়ে হেঁটে অতিক্রম করে স্বপ্নধরার শিক্ষার্থী ও শিক্ষকেরা।

মূলত পর্বতারোহীদের সংগঠন অভি-যাত্রী ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আয়োজিত 'শোক থেকে শক্তি : অদম্য পদযাত্রা'র সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে নিজেরা এই আয়োজন করে স্বপ্নধরা। প্রথাগত বিভিন্ন আয়োজনের বাইরে গিয়ে ব্যতিক্রমী এই আয়োজন অবশ্যই সাহসী পদক্ষেপ। আর রোজার মাসে হওয়ায় এই আয়োজন সফল করা আরো বেশি চ্যালেঞ্জের ছিল। শেষ পর্যন্ত দারুণ সফলতায় শেষ হয় পদযাত্রা।

অভিযাত্রীর অন্যতম প্রধান সংগঠক, বাংলাদেশের প্রথম নারী এভারেস্ট আরোহী নিশাত মজুমদার যোগ দেয়ায় আমাদের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকেরা আরো অনুপ্রাণিত হয়। পথিমধ্যে আরো যুক্ত হয়েছিলেন ফ্রিল্যান্স ফটোগ্রাফার ও

লেখক নাতাশা। নিজের কলেজের অনুষ্ঠানের ফাঁকে সময় বের করে বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে অল্প সময়ের জন্য যুক্ত হয়েছিলেন ঢাকা কমার্স কলেজের শিক্ষক ও অভিযাত্রী কামাল আরিফ।

নিজেদের স্কুল প্রাঙ্গণ থেকে শুরু হওয়া পদযাত্রাটি দুয়ারিপাড়া মোড়, ইস্টার্ন হাউজিং হয়ে বোটানিক্যাল গার্ডেনে প্রবেশ করে। এখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেয় পদযাত্রী দল। এসময় পদযাত্রার উদ্দেশ্য নিয়ে কথা বলেন নিশাত মজুমদার। বোটানিক্যাল গার্ডেন কর্তৃপক্ষের কাছে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানান।

গার্ডেনের মূল ফটক দিয়ে বের হয়ে রাজপথ ধরে দৃপ্ত পদক্ষেপে এগিয়ে চলে পদযাত্রী দল। ঢাকা কমার্স কলেজ মোড় হয়ে, শাহ আলী থানার পাশের সড়ক ধরে, শাহ আলী মাজারের সামনে দিয়ে একসময় পদযাত্রী দল পৌঁছে যায় বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে।

জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধায় হাঁটু গেড়ে উচ্চারণ করে শপথ বাক্য, "হে আমাদের মহান অগ্রজেরা, তোমাদের উপর অর্পিত কর্তব্য তোমরা পালন করেছো অসীম সাহসিকতায়, বিরল ভালবাসায় আর নিপুণ নিষ্ঠায়। কর্তব্যের সময় এবার আমাদের।

জীবন উৎসর্গকারী হে শ্রেষ্ঠ সন্তানেরা, তোমাদের সাহস, ভালোবাসা ও নিষ্ঠা সঞ্চারিত হোক আমাদের হৃদয়ে, মস্তিষ্কে। শহীদের রক্তের মতো উজ্জ্বল জ্বলে উঠুক আমাদের মেধা-মনন, শিল্পবোধ ও রুচি। অসাম্প্রদায়িক মানবিকতা, জ্ঞান-দক্ষতা ও সাধনা-শক্তিতে সমাজ হয়ে উঠুক বলীয়ান।

যে মহান আত্মত্যাগে আমরা আজ উচ্চশির-স্বাধীন, সেই ত্যাগ স্মরণ করে শপথ নিই - তোমাদের আত্মত্যাগ বৃথা যেতে দেবো না। যে শক্ত ভিত্তির পত্তন তোমরা করেছো, তারই উপর নির্মাণ করবো সৌধের পর সৌধ। সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক সৌধ, অর্থনৈতিক উন্নয়নের সৌধ, সম্প্রীতির সৌধ, আর জাতির নব জাগরণের সৌধ।"

পুরো আয়োজনের পেছনে মূল কারিগর আমান উল্লাহ স্যারের প্রতি কৃতজ্ঞ স্বপ্নধরা পরিবার। সেইসাথে প্রধান শিক্ষক সাগরিকা দাস ও অন্যান্য শিক্ষকদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা। কৃতজ্ঞতা শিক্ষার্থীদের প্রতি।

শোক থেকে শক্তি : অদম্য পদযাত্রা

স্বপ্নধরার উদযাপন

প্রিয় স্বাধীনতার জন্য যে সকল অকুতোভয় বীর সন্তানরা বিলিয়ে দিয়েছেন তাদের তাজা প্রাণ সে সকল শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান জানানোর জন্য আমরা 'শোক থেকে শক্তি : অদম্য পদযাত্রা'য় সোহাগ স্বপ্নধরা পাঠশালার পক্ষ থেকে ৫২ জন শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করেছিলাম।

সোহাগ স্বপ্নধরা পাঠশালা থেকে শুরু করে শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ পর্যন্ত পায়ে হেঁটে চলা, এটা আমার কাছে এক বিশেষ পাওয়া। 'শোক থেকে শক্তি : অদম্য পদযাত্রা'য় অংশগ্রহণ করতে পারা আমাদের বর্তমান প্রজন্মের জন্য বিশেষ সৌভাগ্যের। এই পদযাত্রা বার বার মনে করিয়ে দেয় সেই ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চের কথা। আমাদের স্বাধীনতার এনে দিতে হাজার হাজার মানুষ তাদের জীবন বিসর্জন দেয়। সেই অবদান কখনো ভোলার নয়। স্বাধীন জাতি হিসেবে বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে শিখিয়েছে স্বাধীনতা দিবস। তাই, পায়ে হেঁটে এই পথটুকু অতিক্রমের বিষয়টি আমাদের জন্য গর্বের। ২৬ মার্চ সকাল ৭টায় স্কুল থেকে জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে শুরু হয় আমাদের পদযাত্রা'। আমরা মুক্তির গান গাইতে গাইতে পথ চলতে শুরু করি। তারপর আমরা বোটানিক্যাল গার্ডেনে গিয়ে বাংলাদেশের প্রথম এভারেস্ট আরোহী নারী নিশাত মজুমদার আপুর কাছ থেকে সেই ১৯৭১ সালের পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নির্যাতন ও গণহত্যার কথা শুনি। আপুর কথা শেষ হলে আমরা পুনরায় হাঁটতে শুরু করি। প্রায় ৫ কিলোমিটার পথ পাড়ি দেওয়ার পর আমরা পৌঁছে যাই শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে। সেখানে গিয়ে শহীদদের রেখে যাওয়া দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে আমরা শপথ পাঠ করি। শপথ পাঠ শেষে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে আমরা বাড়ি ফেরার উদ্দেশ্যে রওনা দেই। এমন এক সুন্দর ঐক্যবদ্ধ কাজের অংশ হতে পেরে আমি গর্বিত।

মুক্ত স্বাধীন দেশের জন্য
দিয়ে গেছে যারা প্রাণ..! গড়বো আমরা সোনার বাংলাদেশ..!!
রাখবো তাদের মান...।

সিমা, অভিযাত্রী বন্ধু

প্রতীক্ষার পদযাত্রা

এবার কিছুটা সংশয়ে ও চিন্তায় ছিলাম পদযাত্রা করতে পারব তো কারণ মাহে রমজান। আমার সকল সংশয় দূর করে দিল প্রিয় শিক্ষার্থীরা তারা জানান দিল আমরা ২৬ মার্চ পদযাত্রার জন্য প্রস্তুত। এরই মধ্যে অভিযাত্রী বন্ধুদের ফোন আর যাই কোথায়, প্রাণে সঞ্চার ফিরে এলো; সবাইকে নিয়ে বসে পদযাত্রার পরিকল্পনা করে নিলাম। তারপরও ২৬ মার্চ সকালে কিছুটা হলেও চিন্তায় ছিলাম। একে তো রোজার মাস কিন্তু সকল অবসান দূর করে শিক্ষার্থীরা ঠিক সময়মতো এসে উপস্থিত। মনেই হলো না আমাদের সন্তানদের মধ্যে দেশপ্রেম এবং দেশের ইতিহাস জানার আগ্রহ নেই বলে। ভোরে তাদের উপস্থিতি আমাদেরকে নতুন করে বাঁচার এবং দেশের ইতিহাস জানানোর স্বপ্ন দেখায়। এবারের পদযাত্রার আয়োজন মাহে রমজানের কারণে সংক্ষিপ্তভাবে বেরীরপাড় বধ্যভূমি থেকে ১৯৭১-এর ২০ ডিসেম্বর মৌলভীবাজার সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে মাইন বিস্ফোরণে নিহত অর্ধ শতাধিক মুক্তিযোদ্ধার স্মরণে নির্মিত স্মৃতিসৌধ পর্যন্ত। পদযাত্রী, শিক্ষক, অভিবাবক ও সাংবাদিকসহ সকলের উপস্থিতিতে জাতীয় সংগীতের মধ্য দিয়ে বেরীপাড় গণকবর থেকে যাত্রা শুরু করে পদযাত্রা শেষ হয় মৌলভীবাজার সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে অবস্থিত স্মৃতিসৌধে। অভিযাত্রীর সেই দৃপ্ত শপথ উচ্চারণের মাধ্যমে নীরবতা পালন করে নবীন নবীনারা সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ও অভিযাত্রী কর্তৃপক্ষের কাছে। আপনাদের এই মহতী উদ্যোগের পাশে মৌলভীবাজার গার্লস গাইড এসোশিয়েসন ও হাফিজা খাতুন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় সদা সর্বদা থাকবে। জয় হোক অভিযাত্রী, জয় হোক মুক্তিযুদ্ধের বাতিঘর মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর। আগামীর প্রত্যাশায়...

মাধুরী মজুমদার

মুক্তিযুদ্ধের ব্যাতিক্রমী আলোকচিত্র প্রদর্শনী : যশোর

বিশ্ববিবেক জাগরণ পদযাত্রা ১৯৭১ ও আলোক চিত্রশিল্পী এস. এম. শফির ক্যামেরায় ধারণকৃত ছবি দিয়ে বিভিন্ন স্কুলে-কলেজে মহান স্বাধীনতা দিবস ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২৩ উপলক্ষে মুক্তিযুদ্ধের আলোকচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে। নবীন-নবীনাদের মাঝে ১৯৭১-এর পাকিস্থানিদের বর্বরতা ও স্বাধীনতা মুক্তিকামীদের উপর নির্মমতা এবং মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস জানানো এই প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য। বীর মুক্তিযোদ্ধা এস. এম. শফি ফাউন্ডেশনের আলোকচিত্র প্রদর্শনীর এই কাজ আরও বেগবান হয়েছে বিশ্ববিবেক জাগরণ পদযাত্রা ১৯৭১-এর (বাংলাদেশ হইতে দিল্লী) যশোর জেলার পদযাত্রীদের সম্পৃক্তিতে। এছাড়া জেলা শিল্পকলা একাডেমীর কালচারাল অফিসার মো. হায়দার আলী মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক আলোকচিত্র গ্যালারিতে প্রদর্শনের জন্য সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করেছেন। এবারে স্বাধীনতার ৫২ বছরের মূর্ত প্রতীক হিসেবে যশোর কলেজ, ফতেপুর ইউনিয়ন পরিষদ, বালিয়াডাঙ্গা মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, সেঞ্চুরী প্রি-ক্যাডেট স্কুল, রহিমপুর সরকারি প্রাথ মিক বিদ্যালয় ও জেলা শিল্পকলা একাডেমী প্রাঙ্গণে প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। প্রদর্শনীতে আলোকচিত্র শিল্পী এস এম শফির শতাধিক ছবি এবং বিশ্ববিবেক জাগরণ পদযাত্রা ১৯৭১-এর বিভিন্ন ছবি প্রদর্শিত হয়েছে। প্রদর্শনীটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা শিল্পকলা একাডেমী কালচারাল অফিসার মো. হায়দার আলী, সহকারী শিক্ষা অফিসার সদর যশোর, এস, এম, শফি ফাউন্ডেশনের পরিচালক বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুর রহীম (কালু), সাধারণ সম্পাদক স্বাধীকা রউশনী ফৌজী, উপদেষ্টা সাইফুল আলম, সদর উপজেলার চেয়ারম্যান ফরিদ আহম্মেদ চৌধুরী, পদযাত্রী দলের সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. অহিদুজ্জামান চাকলাদার (মুকুট), বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. আবু বক্কর সিদ্দীক, অনুপ দাস ও বীনা রানী সরকার প্রমুখের সহযোগিতায়। মুক্তিযুদ্ধের আলোকচিত্র প্রদর্শনীতে যে সকল ছবি স্থান পেয়েছে তার অধিকাংশই গেরিলা মুক্তিযোদ্ধা ও আলোকচিত্র শিল্পী এস, এম, শফির জেনিথ ক্যামেরায় তোলা। পবিত্র মাহে রমজানের পরে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পর্যায়ক্রমে এই প্রদর্শনী চলবে কেননা নবীন প্রজন্ম প্রদর্শনী দেখে জানতে পারবে পাকিস্তানী বাহিনী কত বর্বর কর্মকান্ড চালিয়েছে নিরীহ বাঙালিদের উপর। ছবির পাশাপাশি রয়েছে আলোকচিত্র শিল্পী এস এম শফির মুক্তিযুদ্ধে ব্যবহৃত হেলমেট, রনাঙ্গণের খবর শোনা ফিলিপস রেডিও এবং ১৯৬৯ সালে যশোর ঈদগা মাঠের জনসভায় বঙ্গবন্ধুর দেয়া ভাষণের রেকর্ড এখনও অক্ষত আছে। এই স্মৃতিময় স্মারকগুলো সংরক্ষণ করা অতীব জরুরি।

সানোয়ার আলম সানু, যশোর

নেত্রকোণা জেলায় প্রদর্শিত হলো ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

বাংলাদেশের ৬৪টি জেলার মধ্যে হাওড় বেষ্টিত একটি জেলা নেত্রকোণা। ধারণা করা হয় নেত্রকোনার আদি নাম ছিল নাটেরকোনা বা কালিগঞ্জ। এ জেলার নগর সভ্যতা গড়ে উঠেছিল একটি কালিমন্দিরকে ঘিরেই। তৎকালীন গৌরীপুরের জমিদার রাজ রাজেশ্বরী দেবীর নির্দেশে তার পুত্র শ্রী ব্রজেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী মহাশয় শ্রী শ্রী সর্বমঙ্গলা দেবীর নামে শ্রী শ্রী কালিমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। সে সময়ে হিন্দুদের আদিক্যই ছিল এ অঞ্চলে বেশি। পর্যায়ক্রমে মুসলমানদের বাসস্থান বাড়তে থাকে। ধর্মীয় সম্প্রীতি বজায় রেখে চলেছে পূর্বনাম নাটোরকোণা বা কালিগঞ্জের আধুনিকায়ন নেত্রকোণা।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আয়োজিত 'নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধকরণ' শিক্ষাকর্মসূচির আওতায় ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের দ্বিতীয় বারের মতো নেত্রকোণা জেলার ১০টি উপজেলার মধ্যে ৯টিতে বাস্তবায়ন করা হয়। ১৮-২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত প্রাকযোগাযোগ এবং ২৫ ফেব্রুয়ারি থেকে ২১ মার্চ ২০২৩ পর্যন্ত ২১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়।

কর্মসূচি চলাকালে জেলা প্রশাসক অঞ্জনা খান মজলিশ, নেত্রকোণা জেলা পুলিশ সুপার মো. ফয়েজ আহমেদ এবং অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক অনিমেষ সোম (শিক্ষা ও আইটি) ও এনডিসি মেহেদী হাসান আমাদের সার্বিক সহযোগিতা করেন। পূর্বধলা জগৎমণি সরকারি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ে ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রদর্শনী চলাকালীন পূর্বধলা উপজেলা প্রশাসন শেখ জাহিদ হাসান প্রিন্স উপস্থিত ছিলেন। নেত্রকোণা জেলার গৌরবজনক মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রয়েছে। এখানে সেক্টর কমান্ডার ছিলেন মেজর আবু তাহের। নেত্রকোনা জেলা থেকে মুক্তিযুদ্ধের উপর বেশ কয়েকটি বই প্রকাশিত হয়েছে, আলী আহাম্মদ খান আইয়োব-এর 'মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস', 'হৃদয়ে মুক্তিযুদ্ধ', 'রণাঙ্গন নেত্রকোণা' লিখেছেন আবু আক্কাস আহমেদ এবং 'লড়াই সংগ্রাম আন্দোলনে নেত্রকোণা' লিখেছেন এমদাদ খান। বৃহত্তর ময়মনসিংহ বিভাগের অন্তর্গত জেলা নেত্রকোণায় লোক ঐতিহ্যের সাথে সাথে রয়েছে মুক্তিযুদ্ধের অনেক গৌরবজনক ইতিহাস।

মুক্তিযুদ্ধের সময় নেত্রকোণা জেলা ১১ নং সেক্টরের অধীনে ছিল। নেত্রকোণার রণাঙ্গনগুলোর দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায় ৫০ জন বীর মুক্তিযোদ্ধা মুক্তিযুদ্ধে শাহাদাৎ বরণ করেছেন। নেত্রকোণা ১৯৭১ সালে ৯ ডিসেম্বর পাকিস্তানি হানাদার মুক্ত হয়।

নতুন প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধের বীরত্বগাথা ইতিহাস পৌঁছে দেয় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর। মুক্তিযোদ্ধাদের কাছ থেকে শিক্ষার্থীরা স্থানীয় মুক্তিযুদ্ধের অনেক ইতিহাস সর্ম্পকে জানতে পারছে এই কর্মসূচির মধ্য দিয়ে। এতে মুক্তিযোদ্ধারাও সম্মানিত বোধ করেছেন। পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীরাও উজ্জীবিত হতে পেরেছে।

নেত্রকোণা এখন ময়মনসিংহ বিভাগের একটি জেলা হিসেবে বিদ্যমান। এ জেলার উত্তরে গারো পাহাড় এবং চিনামাটির সাদা পাহাড় অবস্থিত। পাহাড় থেকে বয়ে আসা খরস্রোতের সোমেশ্বরী ও কংস নদী উল্লেখযোগ্য। গ্রীষ্মকালে সোমেশ্বরী নদী হেঁটে পার হওয়া যায়। এ নদীতে অনেক মাছ পাওয়া যায়। এ নদীর তীরে দূর্গাপুরে বিখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা মনি সিং-এর বাড়ি। এখানে টংক আন্দোলনের স্মরণে একটি স্মৃতিচিহ্ন আছে। এখানে প্রতি বছর মনি সিং মেলা অনুষ্ঠিত হয়। টিপু পাগলার বিদ্রোহের জন্যও নেত্রকোণা বিখ্যাত। এখনও টিপু পাগলার কিছু স্মৃতিচিহ্ন ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। নেত্রকোণার বালিশ মিষ্টি বিখ্যাত। একেকটি মিষ্টি এক কেজি বা এক কেজির বেশি ওজনের হয়ে থাকে। একজনের পক্ষে এ মিষ্টি খাওয়া সম্ভব হয় না। তাই কয়েকজন মিলে বালিশ মিষ্টি খেতে হয়। মোহনগঞ্জ মিঠা পানির মাছের জন্য বিখ্যাত। এখানকার জীবনযাত্রা কিছুটা ধীরগতির হলেও ডিজিটাল প্রযুক্তির ছোয়া পেয়ে কর্মচাঞ্চল্য হয়ে উঠছে।

নেত্রকোণা জেলায় প্রায় ১৫টি বধ্যভূমি আছে। এর অধিকাংশ বধ্যভূমির স্মৃতি চিহ্ন নেই। তার মধ্যে হচ্ছে সাতপাই বধ্যভূমি, বিরামপুর বাজার বধ্যভূমি, বিরিশিরি এবং নেত্রকোণা শহরে মগড়া সেতু বধ্যভূমি অন্যতম। এ সেতু বধ্যভূমিতে যুদ্ধের পুরো সময় জুড়েই শতাধিক নিরীহ গ্রামবাসীকে নির্মমভাবে হত্যা করে ফেলে রাখা হয়েছিল এবং লাশগুলো নদীতে ভেসে গিয়েছিল। এখানে একটি স্মৃতিচিহ্নও আছে।

নেত্রকোণা জেলায় কয়েকটি সাংস্কৃতিক সংগঠনকে সক্রিয় মনে হয়েছে। শিল্পকলা একাডেমীও সক্রিয়। তারা অন্যান্য সাংস্কৃতিক সংগঠনকে সহযোগিতা করে থাকে। শিল্পকলা একাডেমীর বড় মাঠের খোলা মঞ্চে প্রধানত এখানকার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। লোকসাহিত্যের একটি প্রধান ঘাঁটি নেত্রকোণা। এখানে প্রচুর বাউল শিল্পী এখনও তাদের দোতরায় সুর তুলে শ্রোতাদের আকৃষ্ট করে থাকে। বাউলসম্রাট জালালউদ্দিন, উকিল মুন্সি প্রমুখের স্মৃতি বিজড়িত নেত্রকোণায় শিল্পী বারী সিদ্দিকী এবং কুদ্দুস বয়াতীরও বাড়ি।

নেত্রকোণায় দর্শনীয় স্থানের মধ্যে দূর্গাপুরে আছে গারো পাহাড়, আছে বিরিশিরিতে 'গারো কালচারাল একাডেমী এবং একাডেমীর ভেতর জাদুঘর, আছে বহেরাতলীতে হাজং বিদ্রোহে শহীদমাতা রাশমনি স্মরণে স্মৃতিচিহ্ন, আছে বিজয়পুরে চিনামাটির খনি, কেন্দুয়ার কুতুবপুরে আছে লেখক হুমায়ুন আহমেদ-এর পৈতৃক বাড়ি। নেত্রকোণা সদরের মদনপুরে আছে শাহ সুলতান-এর মাজার, উনি এ বঙ্গে প্রথম ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করেছেন। মোহনগঞ্জ-খালিয়াজুরিতে আছে বিস্তৃত হাওর, শ্যামগঞ্জের কাজলায় আছে ১১ নং সেক্টরের কমান্ডার কর্নেল তাহেরের সমাধি। কলমাকান্দায় আছে সাত মুক্তিযোদ্ধা শহীদের সমাধি। কলমাকান্দা উপজেলার লেঙ্গুড়া ইউনিয়নে ভারতের মেঘালয় রাজ্যের গাড়ো পাহাড়ের পদদেশে সাত শহীদের এই ঐতিহাসিক সমাধিস্থল। নাজিরপুরের যুদ্ধে যারা শহীদ হয়েছিলেন যারা দেশ মাতৃকার জন্য অকাতরে প্রাণ বিলিয়ে দিয়েছেন তাদের বীরত্বগাথা ইতিহাস সম্পর্কে জানাও নতুন প্রজন্মের প্রয়োজন কেননা সাতজন বীর শহীদের এই তীর্থস্থান মূলত বাংলাদেশের ইতিহাস পুস্তক।

১৯৭১ সালের ২৫ জুলাই। খবর পাওয়া গেল রাতের অন্ধকারে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী কলমাকান্দা আসবে। ওরা রসদ নিয়ে আসবে। এই রসদে খাদ্য সামগ্রী যেমন থাকবে তেমনি থাকবে প্রচুর গোলাবারুদ। মুক্তিযোদ্ধারাও এই সুযোগ হাত ছাড়া করতে চাইলেন না। পরিকল্পনা করা হয় দুর্গাপুর কলমাকান্দার নদী পথে নাজিরপুর বাজারের কাছে পাকবাহিনীর উপর আক্রমণ করা হবে। কোম্পানি কমান্ডার নাজমুল হক-এর নেতৃত্বে মোট ৩টি দলে ভাগ হয় ৪৫ মুক্তিযোদ্ধার একটি গ্রুপ। ২৫ জুলাই সন্ধ্যায় নাজিরপুর বাজারে পৌঁছায়। তিনটি দলই মূলত নাজিরপুর বাজারের সব প্রবেশ পথে সর্তক ভাবে এম্বুশ নেয়। কিন্তু রাত পেরিয়ে ভোর হয়। সকাল নয়টার সময় পাকিস্তান বাহিনী আসার কোনো লক্ষণ না দেখে এম্বুশ প্রত্যাহার করে ক্যাম্পের পথে ফেরার জন্য মুক্তিযোদ্ধারা নাজিরপুর বাজারের এগুতে থাকে। সারা রাত এম্বুশ শেষে পাকিস্তানি পাকবাহিনীদের দেখতে না পেয়ে মুক্তিযোদ্ধারা তখন বেশ উত্তেজিত। কমান্ডার নাজমুল হক এর নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধারা তখন নাজিরপুর বাজারের কাচারি ঘরটি পুড়িয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এই কাচারি ঘরটি ছিল পাকিস্তান বাহিনীর অস্থায়ী ক্যাম্প। শত্রুর আশ্রয়স্থল পুড়িয়ে দেওয়ার মধ্যে একটা সুখ আছে। এই পনের জনের দলটি কিছুটা অসর্তক হয়ে উঠল। বাজারের পাশ ঘেষে বয়ে গেছে নদী। এসময় বাজারের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীতে একটি পালতোলা নৌকা দেখা গেল। নৌকা দেখেই লোকজন দৌড়াদৌড়ি শুরু করল। নৌকা থেকেই ব্রাশফায়ার শুরু করে দিল বর্বর পাকবাহিনী। মুক্তিযোদ্ধারা আর সময় না নিয়ে শুরু করল এক অসম যুদ্ধ। মূহুর্তেই স্টেনগানে ব্রাশফায়ার করেন মুক্তিযোদ্ধারা। শুরুতেই শত্রুর একটি বুলেট কমান্ডারের কণ্ঠনালী ভেদ করে চলে যায়। গুরুতর আহত কমান্ডারকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে সহযোদ্ধারা যুদ্ধ করতে থাকেন। একটা সময় পর্যন্ত মুক্তিযোদ্ধারা প্রাধান্য বিস্তার করে যাচ্ছিলেন। কিন্তু একসময় হঠাৎ করে পাকবাহিনী মুক্তিযোদ্ধাদের ডিফেন্সের ভেতর চলে আসে। মুক্তিযোদ্ধাদের এলএমজি চালাচ্ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা জামাল। পাকবাহিনী প্রচন্ড আক্রমণ শুরু করে জামালের উপর। সে আক্রনে ঘটনা স্থলে জামাল শহীদ হয়। এলএমজি ফায়ার বন্ধ হলে যুদ্ধের পরিস্থিতি পালটে যায়। মুক্তিযোদ্ধাদের দলটি তখন সহযোদ্ধাদের উদ্ধারের জন্য লেঙ্গুড়া বাজারের দিকে এগুতে থাকে। অগ্রসর হওয়া এ দলটি ফায়ার করতে করতে এগুতে থাকে। এ সময় পাক হানাদারদের উদ্ধারের জন্য একটি হেলিকপ্টার উড়ে আসে। কমপক্ষে আট ঘন্টা স্থায়ী হয় এই যুদ্ধ। বিকাল পাঁচটার দিকে ৩ জন নিহত এবং একজন আহত পাকসেনাকে তুলে নিয়ে ত্বরিত গতিতে হেলিকপ্টারের মাধ্যমে পাকবাহিনী প্রস্থান করে। এ যুদ্ধে শহীদ হন নেত্রকোণার বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল আজিজ ও মোহাম্মদ ফজলুল হক, ময়মনসিংহের মুক্তাগাছা উপজেলার বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ ইয়ার মাহমুদ, ভবতোষ চন্দ্র দাস, মো: নুরুজ্জামান, দ্বিজেন্দ্র চন্দ্র বিশ্বাস এবং জামাপুরের বীর মুক্তিযোদ্ধা মো: জামাল উদ্দিন। এই সাতজন বীরশ্রেষ্ঠ মুক্তিযোদ্ধাকে সহযোদ্ধাগণ লেঙ্গুড়া ইউনিয়নের সীমান্তবর্তী ফুলবাড়ী নামক স্থানে সমাধিস্থ করেন যেটি সাত শহীদের মাজার নামে পরিচিত।

বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাসে সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল অর্জন বাংলাদেশের স্বাধীনতা। ১৯৭১ সাল এসেছিল বলেই বাংলাদেশের মানুষ পেয়েছে জাতীয় সংগীত, পেয়েছে বিশ্বদরবারে মাথা উচু করে দাঁড়ানোর অধিকার। পেয়েছে জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে এগিয়ে যাওয়ার আত্মশক্তি। বাংলাদেশের নতুন প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধ দেখেনি। কিন্তু শুনেছে বা বইয়ে পড়েছে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস। নতুন প্রজন্ম যেখান থেকে পড়েছে সেগুলো কতটুকু সঠিক, আমাদের পূর্ববতী প্রজন্ম কি সঠিকভাবে নতুন প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস তুলে ধরেছেন? নাকি নতুন প্রজন্মের সবাই বিকৃত ইতিহাস জেনে বিভ্রান্ত হয়েছে। একটি সঠিক ইতিহাস তারুণ্যকে উদ্দীপ্ত শিখায় পরিণত করতে পারে, যা হয়ে উঠতে পারে নক্ষত্রের মতো সমুজ্জ্বল যার প্রয়াস মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর চালিয়ে যাচ্ছে। তারুণ্যদের স্বপ্ন হবে বাংলাদেশের স্বপ্ন, ভাবনাগুলো হবে বাংলাদেশের ভাবনা, কাজগুলো হবে বাংলাদেশের কাজ। এতেই গড়ে উঠবে সোনার বাংলা, বাস্তবায়িত হবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা।

হাকিমুল ইসলাম
সহকারি কর্মসূচি কর্মকর্তা

বীর মুক্তিযোদ্ধা ডা. মো. মোজাহারউল হান্নান

আমি ডা. মো. মোজাহারউল হান্নান, পিতা : মৃত তেছের আলী, গ্রাম : আমজুপি, পো: আমজুপি, থানা: মেহেরপুর, জেলা : মেহেরপুর।

যুদ্ধ যখন শুরু হয় আমি তখন একজন এমবিবিএস ডাক্তার। ১৯৭০ সালে নভেম্বর মাসে আমি তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের অধিনে সাস্থ্য বিভাগে সহকারি সার্জন হিসাবে চাকরিতে জয়েন করি।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হবার পর রাজশাহীতে যখন পুলিশ ও ইপিআর বাহিনীর সদস্যরা প্রতিরোধ করতে শুরু করল তখন দুই পক্ষেরেই অনেকে আহত হতে থাকল।

তৎকালীন রাজশাহী মেডেইকেল কলেজ হাসপাতালের সুপারিন্টেন্ডেন্ট ছিলেন প্রফেসর এম.আর চৌধুরী। তিনি, আমরা যারা ইয়াং ডাক্তার ছিলাম তাদেরকে ডেকে বললেন, তোমাদের আমি থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি হাসপাতালে। তোমরা এখন থেকে এখানেই থাকবে। বড় বড় প্রফেসররা তখন অনেকেই গা ঢাকা দিয়েছে জীবনের ভয়ে। আমরা তখন আহত যারা আসে ও অন্য সাধারণ রোগীদের চিকিৎসা করি। এর মধ্যে একদিন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর চার-পাঁচজন সিপাহি আহত হয়ে হাসপাতালে আসে। আমরা তাদের চিকিৎসা দেই। তাদের মধ্যে একজন নিয়ে আসার কয়েক ঘন্টা পরেই মারা যায়। সেখানে উপস্থিত পাকিস্তানি আর্মি এসে আমাদের সুপারিন্টেন্ডেন্ট সাহেবকে বলে, তোমার ডাক্তারা আমাদের রোগী মেরে ফেলেছে।

উনি তাদেরকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন, ডাক্তারের দায়িত্ব রোগী মেরে ফেলা নয় তাকে বাঁচানো। উনি বেশ ভয় পেলেন এবং আমাদের এসে বলনেন, ইউ লিভ দিস টাউন।

আমাদের সাথে এক বন্ধু ছিল তার বাড়ি রাজশাহীর চারঘাট বলে একটার জায়গায়। ঠিক হলো আমরা সাত-আট জন ডাক্তার যাবো তার বাড়িতে। আমরা সুপারিন্টেন্ডেন্ট সাহেবকে অনুরোধ করলাম দুইটা এম্বুলেন্স দিয়ে আমাদের পার করে দিতে।

উনি রাজি হলেন। আমরা রাত এগারোটা কি বারোটার দিকে ওই বন্ধুর বাড়িতে পৌঁছলাম। রাতে সেখানে থেকে সকালে আমরা যে যার বাড়ির উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লাম। রাস্তায় এক বন্ধুর বাড়িতে থাকলাম, তারপর আমার এক ফুপার বাড়িতে এসে ফুপাতো ভাইকে নিয়ে বাড়িতে গেলাম।

তখন এপ্রিল মাসের ১০-১২ তারিখ। আমি বাড়িতে আসার দুই তিন দিন পরেই গ্রামে পাক-আর্মি এসে গেছে। কিছু লোককে ধরে ফেলেছে এবং কিছু লোককে মেরেও ফেলেছে।

তখন পরিবারের সবাইকে নিয়ে ধাড়িয়াপুর গ্রামে আমার মেজভাইয়ের শ্বশুরবাড়িতে উঠলাম। সেখানে খেয়াঘাটে গিয়ে দেখি অনেক লোক আসছে। তখন আমরা একটা গুজব শুনলাম যে, শেখ মুজিব আসতেছে।

সেদিন ১৭ এপ্রিল, আমি তখন আমার সমবয়সী কয়েকজনের সাথে হাঁটতে হাঁটতে বৈদ্যনাথতলায় গেলাম। বেলা আড়াইটা তিনটার দিকে দেখি সেখানে বিরাট স্টেজ হয়েছে। তখন তারা গাড়িতে করে ইন্ডিয়া থেকে আসলেন ইন্ডিয়ান আর্মির সাথে। তখন আমরা বুঝতে পারলাম শেখ মুজিব না, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, কামারুজ্জামান, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী এরা এসেছেন। সেখানে সবাই শপথ নিল। আমরা ওই শপথ নেওয়া অনুষ্ঠানটা দেখলাম। ঘন্টা খানিকের অনুষ্ঠান শেষে তারা চলে গেল। আমরাও ফিরে আসলাম।

যখন পাকিস্তানিরা এ খবর শুনতে পেয়েছে, তারা এ দিকে আসতে শুরু করল। আমরা যে আত্মিয়ের বাড়িতে ছিলাম সে গ্রামেও অত্যাচার শুরু হয়ে গেল। আবার ওখান থেকে আমাদের বাড়িতে ফিরে আসলাম। ফিরে এসে তিন-চার দিন থাকলাম।

রেডিওতে তখন ঘোষণা দেওয়া হচ্ছে সারকারি চাকরিতে যারা আছে তাদের কর্মস্থলে যোগ দেওয়ার জন্য। আমার বড়ভাইও সরকারি চাকরি করত, ও চিটাগাং-এ ছিল। সেখান থেকে সে আগরতলা হয়ে ভারতে চলে গেছে। আমাকে আমার আব্বা বললো, তুমি চলে যাও ইন্ডিয়াতে। আমি ইন্ডিয়া চলে গেলাম। ইন্ডিয়া গিয়ে আমাদের এলাকার তৎকালীন এম পি সহিউদ্দিনকে পেলাম। বড়ভাইয়ের সাথে দেখা হলো। এম পি সহিউদ্দিন আমাকে রিফুজি ক্যাম্পে এনরোল করে নিল যাতে দুবেলা দুমুঠো খেতে পারি।

কিন্তু এভাবে আমার ভালো লাগছিল না। তিন-চার দিন পর একটা বিজ্ঞাপন দেখলাম, বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি বলে একটা সমিতি হচ্ছে। আমি ও চিটাগং-এর ডাক্তার প্রদীপকে ওরা রিক্রুট করে নিয়ে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিল। আমরা একেক দিন একেকটা রিফুজি ক্যাম্পে গিয়ে চিকিৎসা ও ওষুধ দিতে থাকলাম।

এভাবে দুই-তিন মাস কাটল। এর মধ্যে কুষ্টিয়ার তৎকালীন জেলা প্রশাসক মহোদয়ের সাথে পরিচয় হলো। তিনি একদিন বললেন, তুমি যুদ্ধক্ষেত্রে যাও। ওখানে আমাদের কিছু ডাক্তার দরকার। আমি রাজি হয়ে গেলাম।

তারপর কলকাতায় গেলাম, ৮নং থিয়েটার রোডে বাংলাদেশের তৎকালীন সেক্রেটারিয়েট অফিসে। ওখানে আরো কয়েকজন ডাক্তার অন্য দিক থেকে এসেছে।

সেখানে দুই-দিন হাতে কলমে ট্রেনিং-এর পর আমি, ডা. সৈয়দ আসাদুজ্জামান ও ডা. সুশীল কুমার বিশ্বাস এই তিন জনকে একটা জিপে করে পাঠিয়ে দেওয়া হলো নদীয়া জেলার বয়রা গ্রামে ৮ নং সেক্টরের হেডকোয়ার্টারে।

৮ নং সেক্টরের সেক্টর কামান্ডার ছিলেন কর্নেল মঞ্জুর। তিনি আমাদের রিসিভ করলেন। সেখানে ট্রেঞ্চ কেটে মাটির নিচে হাসপাতাল করা হয়েছে। আমরা সেখানেই চিকিৎসা দিতে লাগলাম আহত মুক্তিযোদ্ধাদের। আমাদের চোখের সামনে কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা মারাও গেলো।

তারপর ৬ তারিখে ভারত রিকগনিশন দিল। সেদিন তুমুল যুদ্ধ হলো। পাকিস্তানি বাহিনী যশোর শহর ছেড়ে পালালো। আমরা আমাদের সবকিছু নিয়ে রাত দুইটা-তিনটার দিকে যশোর শহরে আসলাম। যশোর সার্কিট হাউজে আমরা উঠলাম।

১১ তারিখে যশোরে প্রথম পাবলিক মিটিং হলো। ওই মিটিং আমরা অরগানাইজ করেছি। এভাবে কিছুদিনের মধ্যে দেশ স্বাধীন হলো। আমি জেনারেল মঞ্জুরকে গিয়ে বললাম, মূলত আমি এক জায়গায় চাকরি করতাম। আমি কি এখন সেখানে গিয়ে জয়েন করতে পারি। তিনি বললেন, কেন তুমি সেখানে যাবে। আমি তোমাকে আর্মির ডাক্তার বানিয়ে নিচ্ছি। আমি বললাম আমি আর্মির চাকরি করবো না। এখানে সাধারণ মানুষের চিকিৎসা করতে পারবো না।

পরে রাজশাহীতে জয়েন করলাম। পরবর্তীকালে আমার এলাকা মেহেরপুরে ট্রান্সফার হয়ে এলাম। তারপরে সেখানেই চাকরি করেছি ।

আমি বিয়ে করেছি ১৯৭৪ সালে। আমার দুই মেয়ে এক ছেলে রয়েছে।

সাক্ষাৎকার গ্রহীতা- **শরীফ রেজা মাহমুদ**

২৭ বছরের পথচলায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

১ম পৃষ্ঠার পর

বাংলাদেশের অভ্যুদয়, তাৎপর্য সম্ভাবনা ও শক্তি শিরোনামে স্বারক বক্তৃতার শুরুতেই তিনি প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরকে প্রাণঢালা অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, "প্রকৃতপক্ষে একটি অসম্ভব ঘটনা ঘটিয়ে শেখ মুজিব সারা পৃথিবীকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। কেউ ভাবেনি দেশ স্বাধীন হবে"।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন ও রাজনৈতিক কর্মকান্ড পর্যালোচনা করে বাংলাদেশের উন্নয়নকল্পে তার গৃহীত নানা ধরনের পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন, "১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুর বিয়োগান্ত ঘটনার পর আমরা সমতার রাস্তায় থাকতে পারিনি। যার ফলে মানুষের প্রতি মানুষের মমত্ববোধ চলে গেছে এবং বৈষম্য অনেক বেশি হয়ে গেছে"।

ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন বলেন বঙ্গবন্ধু তাগাদা দিয়েছিলেন শিল্প ও গ্রামীণ শিল্প স্থাপনে। এ ধারাগুলো বজায় রাখা হয়েছে। আমি মনে করি ওই ধারাটাকে আরো শক্তিশালী করে এখন যে মডেল নিতে হবে সেটা হলো আমাদের প্রবৃদ্ধিটা হবে থ্রু ইন্ড্রাস্ট্রিয়ালাইজেশন"।

সবশেষে তিনি বলেন, "আমরা সেই দিনের অপেক্ষা করি, যে দিন গণতান্ত্রিকভাবে, অসাম্প্রদায়িকভাবে আমরা সোনার বাংলা গড়তে পারবো। সেই দিন বঙ্গবন্ধুর প্রতি আমাদের শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধা নিবেদন করা হবে। সেই দিন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রতিষ্ঠার যে লক্ষ্য, সেটা শতভাগ পূর্ণ হবে।

অনুষ্ঠানে ঘোষণা করা হয়, এখন থেকে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শনের টিকেট অনলাইনে কেনা যাবে। স্মারক বক্তা ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন অনলাইনে টিকেট কেটে প্রক্রিয়াটির উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও আমন্ত্রিত অতিথিগণ অংশগ্রহণ করেন। শিক্ষার্থীরা দেশাত্মবোধক গান ও নৃত্য পরিবেশন করে।

শরীফ রেজা মাহমুদ

রঙ ও রেখায় রঙিন পথ

১ম পৃষ্ঠার পর

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরকে শুভেচ্ছা ও শুভকামনা জানান।

রাজপথে রঙিন আল্পনা অঙ্কন আয়োজনের সূচনা করেন বীর মুক্তিযোদ্ধা আলমগীর সাত্তার বীর প্রতীক। তাকে পরিচয় করিয়ে দেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ম্যানেজার চন্দ্রজিৎ সিংহ। আলমগীর সাত্তার সম্পর্কে তিনি বলেন, আলমগীর সাত্তার একজন বৈমানিক। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ অবদানের জন্য বাংলাদেশ সরকার থাকে বীর প্রতীক খেতাব প্রদান করে। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি তাতে যোগ দেন। প্রথমে ২ নং সেক্টরে ও পরে মুক্তিবাহিনীর বিমান উইংয়ের হয়ে লড়াই করেন। স্বাধীনতার পর তিনি বাংলাদেশ বিমানের বৈমানিক হিসাবে কাজ করেন।

বীর মুক্তিযোদ্ধা আলমগীর সাত্তার শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন, "তোমরা ১০০ বছর বাঁচবে, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সাথে থাকবে। আমরা আর কত দিন, তোমাদেরকেই দায়িত্বটা গ্রহণ করতে হবে।" পরে তিনি সড়ক রাঙিয়ে রাজপথে রঙিন আল্পনা অঙ্কন আয়োজনের সূচনা করেন। ভোররাত পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সামনের রাস্তা আল্পনার রঙে রাঙিয়ে তোলে। এ সময় তারা নেচে-গেয়ে তাদের এই অক্লান্ত পরিশ্রমের সময়টি উপভোগ করে।

শরীফ রেজা মাহমুদ

তিন বিশ্ববিদ্যালয়ে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক আলোচনা : ট্রাস্টি মফিদুল হক

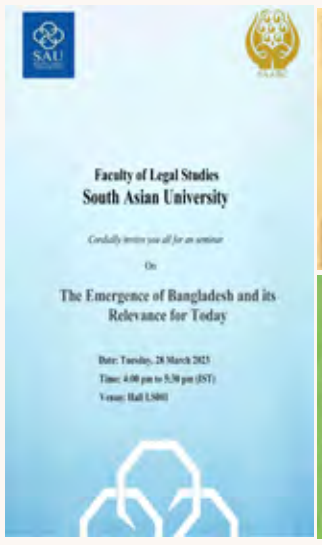

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে নানাভাবে সম্পৃক্ত হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর। এর ধারাবাহিকতায় গত ১৭ মার্চ ২০২৩ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৩তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে নর্থ-সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত আলোচনা সভায় 'জাতির জন্মগাথা ও ভবিষ্যতের অভিযাত্রা' বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেন মুক্তিযুদ্ধধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক।

২৮ মার্চ ২০২৩ Faculty of Legal Studies, South Asian University, Delhi আয়োজিত এক সেমিনারে `The Emergence of Bangladesh and its Relevance for Today' শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন মুক্তিযুদ্ধধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক।

ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া-প্যাসেফিক স্বাধীনতা দিবসকে ঘিরে গত ৩০ মার্চ ২০২৩ আয়োজন করে 'ইতিহাস ও নতুন প্রজন্ম' শীর্ষক আলোচনা অনুষ্ঠানে মূল বক্তব্য প্রদান করেন মুক্তিযুদ্ধধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে নতুন স্মারক

একাত্তরে 'বাংলাদেশ মুক্তিসংগ্রাম শিল্পী সংস্থা' পরিবেশিত গীতি-আলেখ্য 'রূপান্তরের গান'-এর মূল স্ক্রিপ্ট স্মারক হিসেবে গ্রহণ করলো মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর। ৪ এপ্রিল ২০২৩, যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী মুক্তিযোদ্ধা এনামুল হক মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ও সদস্য-সচিব সারা যাকের-এর নিকট এ অমূল্য দলিল হস্তান্তর করেন। ১৯৭১ সালে ২৫ মার্চ পাকিস্তান সেনাবাহিনী গণহত্যা শুরু করলে মুক্তিকামী শিল্পী ও সাংস্কৃতিকর্মীরা দেশত্যাগে বাধ্য হন। দেশত্যাগী শিল্পী ও সাংস্কৃতিকর্মীরা কলকাতার ১৪৪ লেনিন সরণির বাড়িতে প্রতিষ্ঠা করে 'বাংলাদেশ মুক্তিসংগ্রাম শিল্পী সংস্থা'। মুক্তিযুদ্ধের সময় এ সংস্থাটি শরণার্থী শিবির, মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ ক্যাম্প এবং মুক্তাঞ্চলে সংগীত পরিবেশন করে। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে আন্তর্জাতিক জনমত গঠনে সচেষ্ট থ াকার পাশাপাশি বাংলাদেশের ইতিবৃত্ত এবং পরিস্থিতি যথাযথভাবে তুলে ধরা এবং কলকাতা, দিল্লীসহ ভারতের বিভিন্ন স্থানে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে। সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার উদ্দেশে সংস্থাটি একটি ধারাবিবরণী তৈরি করে। গীতি-আলেখ্যটির নাম ছিল 'রূপান্তরের গান'-এর গ্রন্থনা করেন শাহরিয়ার কবির।

বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকী : শিশু-কিশোর আনন্দ আয়োজন

গত ১৭ মার্চ ২০২৩ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষ্যে এক শিশু-কিশোর আনন্দানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এছাড়াও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের আয়োজনে ঐকতান সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্রের সহ-আয়োজনে এবং ঢাকা চারু ও কারু কেন্দ্রর অংশ গ্রহণে 'আমরা শান্তি চাই' শ্লোগানে 'বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার নেতা' শীর্ষক শিশু-কিশোরদের দ্বারা বঙ্গন্ধুর ছবি অঙ্কন ও তা প্ল্যাকার্ড হিসেবে প্রদর্শন উৎসব মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ভাস্কর্য চত্বরে আয়োজিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে শিশু-কিশোরদের উপস্থিত থেকে উৎসাহ প্রদান করেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ও সদস্য সচিব সারা যাকের।

১৫ আগস্টে শহিদ সকলের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদানের মধ্য দিয়ে আনন্দানুষ্ঠানের শুরুতেই ২টি নাচ ও ২টি গান গেয়ে অংশ গ্রহণ করে ইঞ্জিনিয়ারিং গাল্‌স স্কুল এন্ড কলেজের শিক্ষার্থীরা। তারা 'মাঝি তুই না ছাইড়া দে' এবং 'সেই রেল লাইনের ধারে মেঠো পথটির পাড়ে দাঁড়িয়ে গান দুটি পরিবেশন করে। এছাড়াও তারা 'বঙ্গবন্ধু মানে শক্তি, বঙ্গবন্ধু মানে মুক্তি, বঙ্গবন্ধু মানে বাংলাদেশ' কোলাজ নৃত্য এবং 'স্বাধীনতা শব্দটি যেভাবে আমাদের হলো' কবিতার সাথে আরেকটি কোলাজ নৃত্য পরিবেশন করে।

এরপর ব্রাইট স্কুল এন্ড কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন হয়। অনুষ্ঠানে তারা ২টি দলীয় নৃত্য, ৩টি সংগীত এবং ১টি একক নৃত্য পরিবেশন করে। এসময় মাইলসের 'আজ জন্মদিন তোমার' ব্যান্ড সংগীতের সাথে নাচ, 'চলো বাংলাদেশ' গানের সাথে মন মাতানো নাচ প্রদর্শন করে। তারপর 'মাতৃভূমি এই যে আমার দেশ', 'শোন একটি মুজিবরের থেকে' এবং 'পলাশ ঢাকা, কোকিল ডাকা আমার এই দেশ ভাইরে' দেশের গান পরিবেশন করে। সবশেষে ব্রাইট স্কুল এন্ড কলেজের শিক্ষার্থী একক নৃত্য 'গর্জে ওঠো আবারও' পরিবেশিত হয়।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে ঘাসফুল শিশু সংগঠন 'ওরে গৃহবাসী' রবীন্দ্র সংগীতের সাথে নৃত পরিবেশন করে কিশোরী বন্ধু শশী। অনুষ্ঠানের সার্বিক তত্ত্বাবধান ও সঞ্চালনার দায়িত্ব পালন করেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের অনুষ্ঠান ব্যবস্থাপক রফিকুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে ঢাকা মহানগরের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক ও অভিভাবকগণ অংশগ্রহণ করেন। সবশেষে শিশু-কিশোরদের জয় বাংলা শ্লোগানে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

শরীফ রেজা মাহমুদ

ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর : রিসার্চ অ্যান্ড কোলাবরেশন চুক্তি স্বাক্ষরিত

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর এবং ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি (ইউআইইউ)-এর মধ্যে রিসার্চ অ্যান্ড কোলাবরেশন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান ২১ মার্চ ২০২৩ ইউআইইউ ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন ট্রাস্টি ও সদস্য সচিব সারা যাকের। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ইউআইইউ'র মাননীয় উপাচার্য (ভারপ্রাপ্ত) প্রফেসর ড. মো. আবুল কাশেম মিয়া।

ইউআইইউ-এর উপাচার্য (ভারপ্রাপ্ত) এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ও সদস্য সচিব নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির (ইউআইইউ) ইনস্টিটিউট ফর অ্যাডভান্স রিসার্চের (আইএআর) নির্বাহী পরিচালক ও সাবেক উপাচার্য প্রফেসর ড. এম. রিজওয়ান খান, রেজিস্ট্রার ডা. মো. জুলফিকার রহমান। এই সমঝোতা চুক্তি অনুযায়ী ইউআইইউ এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর যৌথভাবে গবেষণা সহযোগিতার মাধ্যমে গবেষণা উন্নয়নে কাজ করাসহ বিভিন্ন গবেষণায় যৌথভাবে গবেষণা করবে। এই চুক্তি একাডেমিয়া এবং ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে সেতুবন্ধন এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস গবেষণা উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

উক্ত অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার, বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভাগীয় প্রধানগণ, শিক্ষক-শিক্ষিকা, কর্মকর্তাবৃন্দ এবং আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বিশেষ ক্রোড়পত্র

এপ্রিল ২০২৩

শেষ হলো একাদশ লিবারেশন ডকফেস্ট বাংলাদেশ

দেখতে দেখতে শেষ হয়ে গেল ১১তম লিবারেশন ডকফেস্ট বাংলাদেশ ২০২৩। Documentary for better future - এই প্রতিপাদ্য নিয়ে ২০০৬ সালের ২০-২৬ ডিসেম্বর প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হয়েছিলো প্রথম আন্তর্জাতিক মুক্তি ও মানবাধিকার বিষয়ক প্রামাণ্যচিত্র উৎসব। প্রথম উৎসবের পরিচালক ছিলেন ট্রাস্টি ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর চলচ্চিত্র কেন্দ্রের উপদেষ্টা মফিদুল হক এবং সমন্বয়ক ছিলেন আমাদের প্রিয় রফিকুল ইসলাম এবং আনন্দ। দেখানো হয়ছিল দেশ-বিদেশের ৪০টি চলচ্চিত্র। উৎসবের কান্ট্রি ফোকাস ছিল ফিলিস্তিন। নিয়মিত আয়োজনের ফলে মুক্তি ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের এই উদ্যোগটি হয়ে উঠছে একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক উৎসব।

১১তম লিবারেশন ডকফেস্ট বাংলাদেশ ২০২৩ গত ৯-১৩ মার্চ অনুষ্ঠিত হয়। এবারের উৎসবে ৪০টি দেশের ৯১টি প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়। প্রতিবারের মতো এবারো প্রদর্শনীর পাশাপাশি নানা ধরনের কর্মসূচি আয়োজিত হয়। বাংলাদেশের সোনালি যুগের চলচ্চিত্রের স্থিরচিত্র, পোস্টার ও স্মারক নিয়ে প্রদর্শনী, প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ কর্মশালা, খ্যাতিমান অভিনেতা রাইসুল ইসলাম আসাদের মাস্টারক্লাস, আন্তর্জাতিক প্রামাণ্যচিত্র নির্মাতা তান পিন পিনের রেট্রোস্পেকটিভ ইত্যাদি। করোনা মাহামারি পরবর্তী উৎসবগুলোর মধ্যে এবারই প্রথম দেশের বাইরে থেকে জুরি এবং ওয়ার্কশপের জন্য মেন্টর অংশগ্রহণ করেন। ৫ দিন ব্যাপী এই উৎসবে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ৩টি ভেনু এবং ফিল্ম আর্কাইভের ১টি ভেনুতে মোট ৪৭টি প্রদর্শনী হয় যাতে প্রায় দু হাজার দর্শনার্থী চলচ্চিত্র উপভোগ করেন। উৎসব ৫ দিনের হলে বাংলাদেশের সোনালী যুগের চলচ্চিত্রের স্থিরচিত্র, পোস্টার ও স্মারক নিয়ে প্রদর্শনী চলে ১০ দিন, ১৯ মার্চ পর্যন্ত যা চলচ্চিত্রপ্রেমী ও সাধারণ দর্শনার্থীদের নজর কেড়েছে।

উৎসবে একইসাথে চলে চলচ্চিত্র নির্মাণ কর্মশালা যেখানে ভারত থেকে নীলোৎপল মজুমদার, রণজিৎ কুমার রায় এবং বাংলাদেশ থেকে আকা রেজা গালিবসহ ১৫ জন চলচ্চিত্র নির্মাতা অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালার পিচিং সেশনটি হয় বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের সেমিনার রুমে। যেখানে জুরি হিসেবে মেন্টরদের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন ট্রাস্টি ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর চলচ্চিত্র কেন্দ্রের উপদেষ্টা মফিদুল হক। এবছর Exposition of Young Film Talents কর্মশালা থেকে তিনটি চলচ্চিত্রের নির্মাণ প্রস্তাবকে নির্মাণ সহায়তা প্রদানের জন্য নির্বাচন করা হয়।

১. আবিদ মল্লিকের 'অপবিত্র পানি' (পাঁচ লক্ষ টাকা)
২. শোয়েব হকের 'ঘাতকের জাল' (তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা)
৩. মো. সাখাওয়াত হোসেনের 'আন্ডা স্টোরি' (রিসার্চ গ্রান্ট)

এবছর জাতীয় প্রতিযোগিতা বিভাগে মেহজাদ গালিবের 'বিন্দু থেকে বৃত্ত:একজন বকুলের আখ্যান' বিশেষ জুরি পুরষ্কারের জয়ী হন। এ বিভাগের জুরি হিসেবে ছিলেন চলচ্চিত্র পরিচালক ও চিত্রনাট্যকার নুরুল আলম আতিক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিল্ম, ফটোগ্রাফি ও টেলিভিশন বিভাগ-এর সাবেক চেয়ারপার্সন ও সহকারী অধ্যাপক হাবিবা রহমান এবং লেখক-অনুবাদক ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক জি এইচ হাবিব।

আন্তর্জাতিক সেরা প্রামাণ্যচিত্র পুরষ্কারের জন্য নির্বাচিত হয় Gonzalo Ballester পরিচালিত স্পেন এর চলচ্চিত্র 'Karim', এবং বিশেষ জুরি পুরষ্কারের জন্য নির্বাচিত হয় Azam Moradi পরিচালিত ইরানের চলচ্চিত্র "Ahmad"এ বিভাগের জুরি হিসেবে ছিলেন সিঙ্গাপুর-এর চলচ্চিত্র নির্মাতা তান পিন পিন, ফ্রান্স-এর প্রযোজক লিও ডেক্লোজো এবং বাংলাদেশ-এর কবি ও সাংবাদিক সাজ্জাদ শরীফ।

প্রতিবারের মত এবারো উৎসবের তরুণ স্বেচ্ছাসেবকরা দুটি ছবিকে পুরস্কার দেয়। এবার ইয়ুথ জুরি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র বিভাগে সেরা চলচ্চিত্র নির্বাচিত হয় চীনের পরিচালক Xiao Yang ও Sisi Chen পরিচালিত 'Through the Window' এবং জাতীয় বিভাগে মাসুদুর রহমান এর 'Unrecognized'।

প্রতিবছরের তুলনায় এবারের উৎসবের অনেক পূর্বেই প্রোগ্রাম ঘোষণা করতে পেরেছি। ফলে প্রচারণায় আমাদের অনেক সময় ছিল। চলচ্চিত্র কেন্দ্রে এবার স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করার জন্য প্রায় ৮ শতাধিক আবেদন জমা পড়ে সেখান থেকে ৫০ জনকে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে নির্বাচন করা হয়। চলচ্চিত্র কেন্দ্রের ১০ জন সমন্বয়ক এবং ৫০জন স্বেচ্ছাসেবক ছিলেন এই উৎসবের মূল চলিকাশক্তি।

এবারের উৎসবের একটিই সীমাবদ্ধতা ছিল নির্বাচিত আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রের পরিচালকদের আমন্ত্রণ জানাতে না পারা। সকলের আগ্রহ দেখে মনে হচ্ছিল হয়তো উৎসবকে কেন্দ্র করে প্রতি বছর একটি নির্দিষ্ট সময়ে আমরা পর্যটকদের জন্য আকর্ষণীয় দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে পারি বাংলাদেশকে।

২০০৬ থেকে ২০২৩ প্রায় ১৭টি বছর পেরিয়ে ১৮তে পদার্পণ করছে এবং তারুণ্যের শক্তিতে বিশ্বজুড়ে নিজের অস্তিত্ব জানান দিচ্ছে লিবারেশন ডকফেস্ট বাংলাদেশ।

মো. শরিফুল ইসলাম (শাওন)

প্রামাণ্যচিত্র 'করিম'

Gonzalo Ballester "করিম" '১১তম লিবারেশন ডকফেস্ট বাংলাদেশ' এর জুরি অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্ত একটি ডকুমেন্টরি। সিরিয় শরণার্থী করিমের জীবনের প্রায় শেষ ২০ বছরের দিনগুলোর সারসংক্ষেপ নিয়ে এই ডকুমেন্টরিটি নির্মাণ করা হয়েছে। করিমের এই জীবনের গল্প আমাদের সামনে তুলে ধরে স্বপ্ন ও বাস্তবতার মাঝে থাকা ঠুনকো একটি সীমারেখা, যা গোটা মানবজাতির জীবনের অবিচ্ছেদ্য এক অংশ। সিরিয়ার গৃহযুদ্ধে করিম তার পরিবার হারায়। করিম তখন স্পেনে চলে আসে নতুন জীবনের খোঁজে। এখানে স্পেন সরকার তার ও অন্যান্য অভিবাসীদের দায়িত্ব নেন। সে খুবই আনন্দিত ছিল যে, সিরিয়ার মতো ভয়াবহ গৃহযুদ্ধের দেশ ছেড়ে সে স্পেনে আসতে পেরেছে এবং নিজের জন্য থাকার জায়গাও পেয়েছে। সিরিয়া থেকে স্পেনে যাওয়ার আগে ও পরে তার জীবনের পরিবর্তন ও এই পরিবর্তনের প্রভাবে তার মনস্তাত্ত্বিক অবস্থার পরিবর্তন এখানে দেখা যায়, যা একসময় করিমের জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে।

স্পেনে প্রথম দিকে তার জীবন কিছুটা স্বাভাবিকই চলছিল। সে অত্যন্ত আশাবাদী ছিল এ ব্যাপারে যে, সে তার জীবনটা এখানে তার ইচ্ছে মতো সুন্দর করে গোছাবে। কিন্তু ধীরে ধীরে সে বুঝতে পারলো এখানে সে সুন্দর জীবনের কোনো সুযোগ বা সাহায্য কারো কাছে পাবে না। সে অন্যান্য অভিবাসীদের সাথে কিছু না কিছু করে সময় কাটাত। সুন্দর জীবনধারণের জন্য তারা তেমন কোনো কাজের সুযোগ সুবিধা পায়নি কেবল থাকার জায়গাটি ছাড়া। করিম অন্য অভিবাসীদের সাথে থাকলেও যেন সম্পূর্ণ একা ছিল।

১০-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

প্রামাণ্যচিত্র ‘করিম’

৯-এর পৃষ্ঠার পর

তাদের সঙ্গ সে উপভোগ করতো তবুও সে তার নিজের মধ্যে একাকীত্ব অনুভব করতো। শুরুতে করিম অত্যন্ত হাসিখুশি প্রাণোজ্জ্বল রকমের মানুষ ছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে তার মাঝে বিষন্নতা ভর করতে লাগলো।

দিন যত যায় তার চোখের সামনে পুরোনো দিনের সব স্মৃতি ভাসতে থাকে। পরিবার ও বন্ধুদের সাথে তার কাটানো সব স্মৃতি, বন্ধুদের সাথে কাটানো মুহূর্তগুলো, কাজকর্ম করা ইত্যাদি তার উপভোগ্য মুহূর্তগুলো যেন তাকে তাড়া করে বেড়ায় সারাক্ষণ। এসব স্মৃতি তার মন ভার করে তোলে। তবে এসব স্মৃতিই আবার তাকে স্বপ্ন দেখার অনুপ্রেরণা দেয়, পূরণ করতে পারার উপযোগের অভাবে তা আর পূরণ করা হয় না।

স্পেনে তার শেষ সময়গুলো তাই মোটেও সুখকর ছিলো না। একদিকে তাদের ছিল না জীবনধারণের জন্যে পর্যাপ্ত রশদ, অন্যদিকে তার মানসিক অবস্থার অবনতি ঘটতে থাকে। সুন্দর জীবন কাটানোর যে স্বপ্ন সে দেখেছিলো, সে স্বপ্নগুলো ধীরে ধীরে মুছে যেতে থাকে তার মন থেকে। তার মনে দিন দিন ক্ষোভ জমতে থাকে। তার মনে হতে থাকে, মানুষ তো সাহায্য করেই না, বরং আল্লাহও তাকে সাহায্য করে না। এ কারণেই সিরিয়া ছেড়ে স্পেনে এসেও তার অবস্থার কোনো উন্নতি হচ্ছে না বরং আরও খারাপ হচ্ছে।

জীবনের একটি সময়ে তার মনে হতে থাকে যে, সে

যেন কারো কণ্ঠস্বর শুনতে পায়। তার মনে হয় কেউ তার সাথে কথা বলছে। তার এমন মনোভাবের কারণ স্বভাবতই তার পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও তার ফেলে আসা সময়। এ দুইয়ের মাঝে সমন্বয় করতে করতে করিম তার মানসিক সুস্থতা হারাতে বসে। তার মানসিক শক্তি এতোই কমতে থাকে যে, সে আর নিজেকে সামলাতে পারে না। ফলে তার শারীরিক অবস্থারও অবনতি হতে থাকে। Gonzalo Ballester ডকুমেন্টরিতে যেভাবে করিমের সুখ-দুঃখের দিনগুলো তুলে ধরেছেন তা সত্যিই প্রশংসার যোগ্য। করিমের অতীতের সুসময় নিয়ে তার মনোভাব, স্পেনে আসার পরবর্তী সময়ে তার স্বপ্ন, তার জীবনযাপন-অভ্যাস, শরণার্থী জীবনে স্বপ্ন পূরণে ব্যর্থতা এবং তা নিয়ে তার ক্ষোভ, মানসিক অবসাদ সবই স্পষ্টভাবে পরিচালক উঠিয়ে আনতে পেরেছেন ক্যামেরার সামনে। তিনি সহমর্মী হওয়ায় করিমও তার জীবনের গল্প এই ছবির মাধ্যমে সবাইকে জানাতে পেরেছেন।

সম্পূর্ণ ডকুমেন্টরি দেখে আমার করিমের জন্য মায়াই হলো। যে ইচ্ছে নিয়ে সে পাড়ি জমিয়েছিল স্পেনে, তা তো পূরণ করতে পারলোই না, বরং তার জীবন আরও বিষাদময় হয়ে উঠলো। তখন মনে হলো, আসলেই তো! আশা পূরণ না হলে তো বেঁচে থাকার ইচ্ছেও চলে যায়। তবু জীবন কাটাতে হয়। তখন করিমের মতো অতীতের স্মৃতি রোমন্থন করেই বাকি জীবন পার করতে হয়। হয়তো সুযোগ পেলে সে তার স্বপ্ন বাস্তবায়িত করে সুন্দর জীবন পেতে পারতো, অথবা অন্য উপায়ে জীবনটাকে কিছুটা হলেও তার স্বপ্নের কাছাকাছি নিয়ে যেতে পারতো!

তার জীবন আমাদের মনে করিয়ে দেয়, স্বপ্ন আর বাস্তবতার মাঝে অনেক তফাৎ রয়েছে। এ তফাৎ সবার জীবনে দূর করা সম্ভব হয়ে উঠে না।

তাসনিয়া তাবাসসুম জবা
স্বেচ্ছাকর্মী

১০ম লিবারেশন ডকফেস্টে তরুণ জুরিদের সাক্ষাৎকার

২০২০ সাল থেকে লিবারেশন ডকফেস্টে ইয়ুথ জুরি পুরস্কার প্রদান শুরু হয়। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষার্থী, যাদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সিনেমার সাথে সম্পৃক্ততা আছে, গত তিন বছরে তেমন তরুণেরাই জাদুঘরের প্রামাণ্যচিত্র উৎসবে ইয়ুথ জুড়ি হিসেবে কাজ করেছেন। তেমনি তিন তরুণ শিক্ষার্থী অরিজিৎ দিগন্ত, অনন্যা সরকার এবং রেহনুমা বিনতে হোসেন এক আড্ডায় বলেছেন, লিবারেশন ডকফেস্টে ইয়ুথ জুরি হিসেবে তাদের অভিজ্ঞতার কথা।

প্রশ্নকর্তা - লিবারেশন ডক ফেস্টে আপনাদের কাজের শুরু কীভাবে? মানে গত বছর আপনারা যেহেতু ইয়ুথ জুরি ছিলেন, সেটা আপনারা শুরু কীভাবে করেছিলেন?

অরিজিৎ - ফেসবুকে একটা অ্যাড আসে যে এখানে ভলান্টিয়ারিংয়ের জন্য রিক্রুট করা হচ্ছে। আমি আমার বন্ধু কয়েকজনকে বলি। একজন বন্ধু আমাকে বলে যে চলো একসাথে যাই। ওটা থেকেই আসা। এরপর দেখলাম যে সিলেকশন প্রসেসটা ছিল কিছু এমসিকিউ দেয়া, তারপর একটা মুভি দেখানো হয়। ওটা থেকে মূলত ইন্টারেস্ট, যে মুভির উপর রিভিউ দেয়া হয়েছিল। ওটার পরে আসা।

প্রশ্নকর্তা - অনন্যা তোমার কী ইন্টারেস্ট ছিল?

অনন্যা - ভাই যেমন বললেন, প্রথমে অ্যাড দেখে এটায় অ্যাপ্লাই করা। আমি দিদিকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রতি টুকটাক ইন্টারেস্ট ছিলো। ভাবলাম এখানে যদি একটু কাজ করা যায় পাঁচ দিন, ভালোই হয়। তারপর যখন অ্যাপ্লাই করলাম, অ্যাপ্লাই করার পর আমাদের মুভি দেখতে বলা হয়েছিল, মুভির রিভিউ করতে বলা হয়েছিল। এরপর থেকেই এখানে আসা। ডক ফেস্টে কাজ করলাম।

প্রশ্নকর্তা - আপনারা ফিল্মের বাইরে ভিন্ন ভিন্ন এডুকেশনাল ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে এসেছেন। কী করে মনে হলো যে ফিল্ম বা ডকুমেন্টারি নিয়ে কাজ করা যায়?

অরিজিৎ - আমি যেহেতু আই.টি-র মানুষ তাই ফিল্মের সাথে কেনো রিলেটেড? ছোটবেলা থেকে আমার থ্রিলার, মার্ডার-মিস্ট্রি এগুলো ভালো লাগতো। তারপরে আই.টি-র সাথে রিলেটেড হওয়ার পরে টার্গেট ছিল যে এ.আই. দিয়ে এ.আই. রিলেটেড কোনোকিছু বানানো যায় কি-না। যেমন এ.আই. সম্পূর্ণ মুভি স্ক্রিপ্ট লিখবে, তারপরে অ্যানিমেশন যা আছে সবকিছু এ.আই. করবে। এটা গত বছরও আমার উত্তর ছিল যে, এ.আইকে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে যুক্ত করা। আর এখন তো চ্যাটজিপিটিসহ বিভিন্ন এ.আই. সফটওয়্যার দিয়ে মানুষজন কত কিছুই করছে। আমার ইচ্ছা এটাকে আরো দূর নিয়ে যাওয়া। দেখা যাক কতটুক যাওয়া যায়।

প্রশ্নকর্তা - অনন্যা, আপনার?

অনন্যা- আমি অ্যান্থ্রোপলজি ডিপার্টমেন্টের। অ্যান্থ্রোপলজি ব্যাকগ্রাউন্ডের হওয়ায় ডকুমেন্টারি দেখা আমাদের পড়ালেখার সাথে খুবই রিলেটেড। যেমন সেকেন্ড ইয়ারে আমার একটা অ্যাসাইনমেন্ট ছিল যে, একটা সাবজেক্টের উপর আমাকে ডকুমেন্টারি বানিয়ে সাবমিট করতে হয় এবং ওটাকে রিভিউ করা। থার্ড ইয়ারেও এমন কাজ আছে। ডকুমেন্টারি নিয়ে আমার খুব একটা ধারণা ছিল না। যেহেতু আমি ডকফেস্টে

কাজ করেছিলাম, সেখান থেকে ডকুমেন্টারি নিয়ে খুবই ভালো একটা অভিজ্ঞতা হয়। তাই আমি ভালো একটা অ্যাসাইনমেন্ট প্রেজেন্ট করতে পেরেছিলাম।

প্রশ্নকর্তা - রেহনুমা, আপনার কী মনে হয়? এই ডকফেস্ট আপনাকে কীভাবে সাহায্য করেছে?

রেহনুমা- আমার ডিপার্টমেন্টের সাথে জিনিসটা একদমই আলাদা। আসলে আমার ভালো লাগে ফিকশনাল ক্যারেক্টারস বা ফিকশনাল মুভি, যেমন কে ড্রামা অথবা থ্রিলার কোনো মুভি। ডকুমেন্টারি ফিল্ম আগে কখনো দেখা হয়নি। প্রথম দেখা হয়েছিল আমাদের যে ইন্টারভিউ হয়েছিল এখানে সিলেকশনের টাইমে, মার্সিফুল অ্যাঞ্জেল। ওটাই আমার প্রথম ডকুমেন্টারি দেখা। পরবর্তীকালে কাজের মাধ্যমে আরো কিছু ডকুমেন্টারি দেখা হয়েছে।

প্রশ্নকর্তা– এবার গত বছরের উৎসবে দেখা ফিল্মগুলি নিয়ে জানতে চাইবো তিনজনের কাছে।

অরিজিৎ, আপনার থেকে শুরু করি।

অরিজিৎ- আমার চয়েস, মার্সিফুল অ্যাঞ্জেল, যেটা দিয়ে আমাদের সিলেকশন করা হয়েছিল। ফিল্মটা বেশ ইন্টারেস্টিং। এটা মূলত অ্যানিমেশন ফিল্ম ছিল। আট মিনিট বা নয় মিনিটের ছিল। শুরুতে দেখানো হয় যে দুইভাই খেলা করছে। সবাই হাসি খুশি স্বাভাবিক। কিন্তু হঠাৎ যুদ্ধ লাগে দেশের মধ্যে। সবাই ছোটাছুটি করে নিজের জীবন বাঁচানোর জন্য। কিছু কিছু মানুষের রুখে দাঁড়ানো ছিল, যা হারানো তা ফিরে পাওয়ার জন্য এবং যা নিজের ওইটা রক্ষা করার জন্য। সবাই চেষ্টা চালিয়ে যায় কিন্তু এই যুদ্ধের মধ্যে একটা দেশ থাকে এগিয়ে, একটা দেশ থাকে পিছিয়ে। কিন্তু হঠাৎ একটা ট্যাংক দেখায়। ট্যাংক নিজের পথের মধ্যে যা পাচ্ছে সবই ধ্বংস করছে, একাকার অবস্থা। সবাই তখন হতাশ, কী হবে, কীভাবে জয়লাভ করবে, আবার না হবে! তখনই ছোট দুইভাই, তারা অবশ্য যুদ্ধের মধ্যে অংশ নিতে চায় কিন্তু পারে না। যেহেতু ছোট, তাদের নেয়া হয় না। তখনই তারা একটা আশার আলো নিয়ে আসে। খেলাধুলার সময় তারা যে বল নিয়ে খেলা করতো, সেভাবে একটা হ্যান্ড গ্রেনেড ছিল তাদের কাছে। ট্যাংকের ড্রাইভার যেইখানে বসে ওটাকে ককপিট বলা হয়। ওটার মধ্যে ওরা ওই হ্যান্ড গ্রেনেডটা মেরে ট্যাংকটা ধ্বংস করে দেয়। তখনই আবার সবাই আশার আলো ফিরে পায়, সবাই আবার যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। And they were victorious.

অনন্যা - আমার পছন্দের ফিল্মটা ছিল গণফাঁসি ৭৭ এবং এটাকে ইয়ুথ জুরি থেকে আমরা অ্যাওয়ার্ডও দিয়েছিলাম। প্রশ্নকর্তা: গণফাঁসি ৭৭ ভালো লাগার কারণ কী ছিল?

অনন্যা: আমার জন্য এটা খুব তথ্যবহুল ছিল। ১৯৭৭ সালে যে গণফাঁসির একটা ঘটনা ছিল সেটা অন্তত আমি জানতাম না। এবং আমাদের ইয়ুথ জুরি একজন সদস্য ছিলেন যার বাবার সাথে গণফাঁসি ৭৭ এর ঘটনাটার খুবই মিল ছিল। যখন ফিল্ম স্ক্রিনিং হলো, স্ক্রিনিং শেষে আপু বলছে, “এটা তো আমার ফ্যামিলির কাহিনী। আমার ফ্যামিলির সাথেই এমন হয়েছে।” আমরা যখন ফিল্ম দেখছিলাম, দর্শকদের মাঝে অনেকেই ছিল যারা কান্না করছিল। আমরা ‘৭১ নিয়ে জানি, ‘৭৫ নিয়ে জানি, ‘৫২ নিয়ে জানি। **১১-এর পৃষ্ঠায় দেখুন**

তরুণ জুরিদের সাক্ষাৎকার

১০-এর পৃষ্ঠার পর

কিন্তু '৭৭-এ এতো বড় একটা ঘটনা, সেটা নিয়ে কোনো ধারণা ছিল না।

গণফাঁসি ৭৭-এর কাহিনীটা আমি আরো বর্ণনা করি। ওখানে একজনের সাক্ষাৎকার ছিল। তিনি বলছিলেন কীভাবে তিনি বের হতে পেরেছিলেন। আমাদের ইয়ুথ জুরি আপুও বলেছিল তার বাবা ওখান থেকে খুবই কষ্ট করে বের হতে পেরেছিল। That was an emotional par.

প্রশ্নকর্তা - রেহনুমা, আপনার কোন ফিল্মটা ভালো লেগেছে?

রেহনুমা - আচ্ছা, আমার ভালো লেগেছিল 'Room Without a View', যেটা আমরা ইয়ুথ জুরি সবাই সেরা ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম নির্বাচিত করেছিলাম। এটার মূল কাহিনী ছিল লেবাননের কিছু নারী শ্রমিকদের নিয়ে। তাদেরকে নেয়া হতো কিছু এজেন্সির মাধ্যমে, কিছু ছোট ছোট দেশ থেকে যেমন ইথিওপিয়া, কেনিয়া, ফিলিপাইনস, বাংলাদেশ। যে দৃশ্যটা ওখানে দেখানো হয়েছিল সেখানে তিন থেকে চারজন নারীর দৈনন্দিন কাজগুলো দেখানো হয়েছিল। সবশেষে ডকুমেন্টারির ডিরেক্টর রোজার কোরেলার সাথে আমরা অনলাইনে যুক্ত হই। তার সাথে আমাদের একটা সেশন হয়, প্রশ্নোত্তর পর্ব হয়। ওটাও খুব ভালো ছিল।

প্রশ্নকর্তা - আচ্ছা, ইয়ুথ জুরিদের এখানে কাজ করতে কী ধরণের সমস্যা হয়েছিল?

অনন্যা - আমি ব্যক্তিগতভাবে কোনো সমস্যায় পড়িনি। তবে, অনেকগুলি ফিল্ম দেখার ছিল, যেটা একটু ঝামেলাপূর্ণ ছিল কারণ সাথে পড়ালেখাও চালানো লাগতো। এটা একটু সমস্যা ছিল আমার দিক থেকে।

অরিজিৎ - আমার মতে সবচেয়ে বেশি অসুবিধা ছিল যে কিছু কিছু ফিল্ম অনলাইনে দেখা যেতো না। স্ক্রিনিং যখন হচ্ছে তখনই দেখতে হতো। আর ইয়ুথ জুরির সবাই ছিল স্টুডেন্ট। সকালবেলা সময় একদমই আমাদের মিলতো না। কারোরই আসা হতো না মিউজিয়ামে। কিছু কিছু মুভি আছে যেগুলো আমরা একদম দেখার সুযোগই পাইনি। আমি বলবো যে এদিকে ইন্টারএকশন বাড়ানো উচিত ইয়ুথ জুরিদের সাথে। মুভিগুলো আরো বেশি অনলাইনে দেয়া উচিত।

রেহনুমা- আমার এক্সপেকটেশনের দিক থেকে সবকিছুই ঠিক ছিল। আমার কখনোই ডকুমেন্টারি ফিল্ম দেখা হয় নাই। এই ডকফেস্টের মাধ্যমের আমার কিছু ডকুমেন্টারি ফিল্ম দেখা হয়েছে।

ফিল্ম রিভিউ : Things I couldn't tell my mother

এ বছর লিবারেশন ডকফেষ্টের উদ্বোধনী আয়োজনে প্রদর্শিত হয়, বাংলাদেশের চলচ্চিত্র নির্মাতা হুমায়রা বিলকিসের ছবি Things I couldn't tell my mother। উৎসবের স্বেচ্ছাকর্মী জাহরা হাফিজ কিমতি এই ছবি নিয়ে লিখেছেন।

ভারত থেকে পড়াশোনা শেষ করে দেশে পরিবারের কাছে ফিরে আসার পর বিলকিস লক্ষ্য করলেন তার মা আর আগের মতন নেই। যে মা তাকে শিল্পমনা হতে শিখিয়েছেন তিনি আজ শিল্প সৃষ্টি থেকে অনেক দূরে সরে এসেছেন। তার মায়ের মন মানসিকতার পরিবর্তনের কারণ খুঁজতে গিয়ে পরিচালক এই ডুকমেন্টারি ফিল্মটি বানানো শুরু করেন।

ফিল্মের শুরুতে সরিষা খেতে শিশুদের খেলার দৃশ্য মূলত পরিচালকের শৈশবের স্মৃতিচারণা এবং তার স্বাধীনচিত্তের প্রতিরূপ। এরপর আস্তে আস্তে গল্পের ভিতরে প্রবেশ করতে শুরু করলে আমরা দেখি প্রধান চরিত্রে হুমায়রা বিলকিসের মাকে। তিনি আগে খুব সুন্দর কবিতা লিখতেন। কিন্তু হজ্ব করে আসার পর শিল্প-সংস্কৃতি থেকে তিনি মন সরিয়ে নেন এবং মেয়ের কোনো কাজও তার কাছে আর ভালো লাগে না অথচ মেয়েকে তিনিই ছোট বেলা থেকে সবসময় শিল্পচর্চায় উদ্বুদ্ধ করেছেন। মায়ের এই পরিবর্তনের রহস্য উদঘাটন করতেই পরিচালক তার বাবা মা-এর সাথে নিজ বাসায় বসে ক্যামেরা বন্দি করা শুরু করেন তাদের নিজস্ব কথপোকথন। বাবা মা ও মেয়ের সম্পর্কের মাঝে খুবই শান্ত ভূমিকা পালন করেন।

একসময় পরিচালকের মা ইচ্ছা পোষণ করেন মেয়ে যেন হজ্ব করে আসে। কারণ উনি ভাবতেন হজ্ব করে আসলে মেয়ের মন মানসিকতা পরিবর্তন হবে। মায়ের মন রাখতে বিলকিস রাজি হলেও মাহরাম ছাড়া হজ্ব করা যাবে না বিধায় তার মা তাকে বিয়ে করতে বলেন। কিন্তু বিলকিস তখন তার একজন ভারতীয় হিন্দু বন্ধুর সাথে ভালোবাসার সম্পর্কে জড়িয়ে আছেন এবং এ কথা তিনি কোণোভাবেই তার মাকে বলার সাহস করতে পারেননি। যদিও তিনি ভেবেছিলেন মায়ের সাথে তিনি হজ্বে যাবেন এবং ফিরে এসে মাকে নিজের মনের সব কথা খুলে বলবেন।। কিন্তু করোনা মহামারির কারণে তারা

বাসায় আটকা পড়েন। তাদের আর হজ্বে যাওয়া হয়নি। এসময় ঘরে বসে তিনি তার বাবা মাকে আরোও কাছ থেকে দেখার সুযোগ পান। মায়ের পুরোনো কবিতার খাতা খুঁজে বের করেন বিলকিস। সেই কবিতার খাতা থেকে কবিতা পড়ে শোনান তার মা, যাকে দেখলে বোঝা যায় তিনি একসময় অনেক বেশি সৃষ্টিশীল মানুষ ছিলেন।

করোনার মাঝে হঠাৎ করে বিলকিসের বাবা অসুস্থ হয়ে পড়েন, পরীক্ষা নিরীক্ষায় তার ক্যান্সার ধরা পড়ে। পুরো পরিবারে শোকের ছায়া নেমে আসে। বিমর্ষ হয়ে পড়েন মা। পরিবারের এ বিপর্যয় মোকাবেলা করতে গিয়ে ভালোবাসার মানুষের সাথে দূরত্ব তৈরি হয় বিলকিসের। ধর্মান্তরিত হয়ে বিয়ে করতে চাইলেও রাজি হননি বিলকিস। শেষ পর্যন্ত তার ভালোবাসার মানুষও জীবন থেকে হারিয়ে যায়। অন্যদিকে বিলকিস তার মাকে নিয়ে যান সাইকোলজিস্টের কাছে। এভাবে মা-বাবাকে আগলে তার জীবন চলতে থাকে। তিনি যেভাবে গল্পটির শেষ ভেবেছিলেন, তার জীবন সেভাবে আগায়নি। শেষ পর্যন্ত তিনি তার বাবাকে হারান যা ফিল্মটির শেষে জানা যায়। আবার তার ভালোবাসার মানুষেকেও এই ফিল্মটি করার মাঝেই তিনি হারিয়েছেন।

এসব কিছুর মাঝেও বিলকিস আস্তে আস্তে তার মা -এর এই পরিবর্তনের কারণ বুঝতে পারেন। তার মা শুধুমাত্র এটাই নিশ্চিত করতে চেয়েছিলেন যে দুনিয়া থেকে যাওয়ার পরেও যাতে তার সন্তানের জন্য ভালো জীবন নির্ধারণ করে রেখে যাওয়া যায় এবং সুষ্ঠুভাবে ধর্ম পালনেই এটা সম্ভব বলে তার কাছে মনে হয়েছিল। সন্তানের প্রতি ভালোবাসা থেকেই তিনি পরিবর্তিত হয়েছিলেন।

ছবির এই গল্প যত সহজে বলা যায়, দর্শক হিসেবে গল্পটি দেখা তত সহজ ছিল না। আরও চ্যালেঞ্জিং ছিল ধর্মীয় এবং সামাজিক বিভিন্ন বিধিনিষেধ এর বাইরে গিয়ে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এরকম একটি ফিল্ম বানানো, যা পরিচালকের অসীম সাহসিকতার পরিচয় দেয়। নিজের জীবনকে এভাবে জনসাধারণের মাঝে তুলে ধরতে খুব কম মানুষই পারে। বিতর্কিত এই ফিল্মের জন্য পরিচালক নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবিদার।

ঢাকার একটি সাধারণ পরিবারকেন্দ্রিক গল্প থেকে শুরু হয়ে এটি একটি অসাধারণ গল্পে পরিণত হয়েছে যা মানুষের জীবনদর্শনের প্রতি ভিন্ন নজর রাখতে বাধ্য করবে। পরিবারের সদস্যদের উপর ধর্মীয় ও সামাজিক প্রভাবের ফলে সন্তানের সাথে বাবা মায়ের সম্পর্কে যে দূরত্ব সৃষ্টি হয় তার চিত্র এই ফিল্মে বিদ্যমান। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরিচালক তার বাবা-মাকে বুঝতে শিখেছেন।

গল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দর্শকের মনোযোগ ধরে রাখতে পেরেছে এই ছবিটি। দৈনন্দিন জীবনের নানা ঘটনা যেভাবে পরিচালক ক্যামেরাবন্দি করেছেন তা অত্যন্ত চমকপ্রদ। বেশিরভাগ শট নিজের বাসার বিভিন্ন রুমে করা। যখন যে ফ্রেমের গল্প বলা দরকার ছিল, ঠিক সেই ফ্রেমের গল্পই তিনি তুলে ধরেছেন। ফিল্মের শুরুতে দর্শক মনে যেসব উদ্বেগের সূচনা হয়েছিল, ঘটনার ধারাবাহিক উপস্থনায় পুরো গল্পটি খুব সহজে সবার মনে জায়গা করে নিয়েছে এবং মানুষকে পরিবার এবং প্রিয়জনের সাথে সম্পর্কের সূক্ষ্মতা এবং সৌন্দর্য বুঝতে সাহায্য করেছে। করোনার মহামারী কীভাবে প্রতিটি মানুষের জীবনে প্রভাব ফেলেছে সেই দিকটিও এ গল্পে উঠে এসেছে। ফিল্মটি দেখার সময় প্রত্যেকেই তাদের জীবনে পরিবারের সাথে কাটানো বিভিন্ন স্মৃতি খুঁজে পাবে। তাই ফিল্মটি দর্শকমনে গভীর জায়গা করে নিতে পারবে বলে আমি মনে করি।

সাক্ষাৎকার : একজন চলচ্চিত্র নির্বাচক তরুণ চলচ্চিত্র নির্মাতা তানিম ইউসুফ

তানিম ইউসুফ। চট্টগ্রামের তরুণ চলচ্চিত্র নির্মাতা। ২০২০ সাল থেকে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রামান্যচিত্র উৎসবে ফিল্ম সিলেকশন কমিটির সদস্য হিসেবে কাজ করছেন। এই সাক্ষাৎকারে তানিম লিবারেশন ডকফেষ্টের জন্য ছবি সিলেকশন করতে গিয়ে তার অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন।

তানিম ইউসুফ- আমি তামিম ইবনে ইউসুফ। আমি চট্টগ্রাম থাকি। আমি ডকুমেন্টারি ফিল্ম মেকিং প্র্যাকটিস করছি ২০১৮ থেকে। জাদুঘরের মাধ্যমেই আমার ফিল্ম মেকিং প্র্যাকটিস শুরু।

প্রশ্ন- আপনি তো টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে পড়াশোনা করেছেন? কিন্তু সেখান থেকে ফিল্মমেকিং এ কিভাবে এলেন?

তানিম ইউসুফ - হ্যাঁ, আমি তো পড়াশোনা করেছি আসলে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে। টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে পড়াশোনার পর আমি চাকরিও করেছিলাম অনেকদিন। কিন্তু আমার প্রফেশনটা আমাকে ক্রিয়েটিভিটির স্কোপগুলো দিচ্ছিলো না। এরপর চট্টগ্রামে ফিরে গেলে কাউসার হায়দার ভাইসহ অনেকের সাথে যোগাযোগ ঘটে, সিনেমা যাদের আগ্রহ আছে। আমি নিজেও আগে থেকেই সিনেমা দেখতাম। চট্টগ্রামে একটা ক্লাব ছিল বিস্তার। ওখানে সিনেমা দেখতাম, সিনেমা নিয়ে নানা ধরনের আলাপ হতো। সেখান থেকেই আমি ঠিক করি যে, আমি ডকুমেন্টারি ফিল্ম বানাবো।

১২-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

একজন চলচ্চিত্র নির্বাচক তরুণ চলচ্চিত্র নির্মাতা তানিম

১০-এর পৃষ্ঠার পর

আমি ফিকশন ফিল্মে খুব বেশি খুব একটা আগ্রহী হইনি। যদিও শর্টফিল্ম তৈরি করার চেষ্টা করেছি, করেছিও একটা। ডকুমেন্টারিই এখন আমার মুল কাজের ক্ষেত্র।

প্রশ্ন - এখন কোন ডকুমেন্টারির কাজ করছেন আপনি?

তানিম ইউসুফ - এখন আমরা এই যে ২০১৯ এ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের কর্মশালায় যেটা পিচ করেছিলাম, ওইটার এখনো প্রোডাকশন চলছে। 'ঘোস্ট বোট' যেটার নাম। আমি আর কাউসার হায়দার দুজনেই এর পরিচালক। এই ডকুমেন্টারিটা জাদুঘরের ইয়াং ফিল্ম ট্যালেন্ট অনুষ্ঠানেও আমরা পিচ করেছি। তারপর স্কলারশিপ পেয়েছিলাম ওখান থেকে ঢাকা ডকল্যাবে। ঢাকা ডকল্যাব থেকে আমরা এডিনবার্গ পিচে অ্যাপ্লাই করেছিলাম, ওখানে পিচ করেছি। তারপর এবার ডকেজ কলকাতায় আমরা পিচ করেছি।

প্রশ্ন- লিবারেশন ডকফেস্টে ফিল্ম সিলেকশনের অভিজ্ঞতাটা কেমন আপনার? শুরুতে আপনার কাছে এই কাজটা কেমন ছিল, এখন কি রকম মনে হচ্ছে?

তানিম ইউসুফ - এইটা আসলে আমার হ্যান্ডস অন এক্সপেরিয়েন্স। সিলেকশন ও ফিল্ম প্রিভিউ কমিটিতে থাকা, অনেক বড় একটা এক্সপেরিয়েন্স আমার জন্য। কারণ ওইখানে বিভিন্ন ধরনের সিনেমা জমা পড়ে। এমন এমন গল্প দেখেছি আমি। মানে এটা তিন ঘন্টার ডকুমেন্টারি ছিল, একটা গল্প দেখেছি, একটা ইরানিয়ান ফিল্ম মেকারের। যদিও এটা পরে সিলেক্ট হয়নি ফিল্মটা। কিন্তু এই বিচিত্র ধরনের ছবি দেখার ফলে আমার নিজের কাজেও অনেক হেল্প করেছে। কারণ আমি তখন বুঝতে পারি যে আসলে কোন গল্পটা, কোনটা আসলে ভিজ্যুয়ালি অডিয়েন্সকে টাচ করতে পারবে, আবার কোনটা পারবে না। তো এই যে স্টোরি টেলিংয়ের যে ন্যারেটিভ আর্টগুলো কিভাবে তৈরি হচ্ছে। এবার একটা সিনেমার কথা মনে পড়ছে, পাকিস্তানের হিন্দু মেয়েদেরকে জোর করে নিয়ে গিয়ে, মুসলিম বানায়, তারপরে বিয়ে করে। আবার বিয়ে করার কিছুদিন পরে আবার ছেড়ে দেয়। এটা চল্লিশ মিনিটের ডকুমেন্টারি। কিন্তু ওখানে এই চল্লিশ মিনিটের মধ্যে টকিং হেড আছে, মানে ইন্টারভিউ, বসা ইন্টারভিউ আছে। তারপরও এটা খুবই কম্পেলিং একটা স্টোরি, মানে ওইখানে যে এক্টিভিজমটা আছে, যে এনগেইজমেন্টটা আছে, ওইটা যেকোনো অডিয়েন্সকে এনগেইজ করবে ছবির গল্পে। প্রশ্ন - প্রত্যেক বছর আপনারা কোন কোন ক্রাইটেরিয়াগুলোর ভিত্তিতে ফিল্ম সিলেক্ট করেন? এরকম বেসিক কী কী রুলস আছে ?

তানিম ইউসুফ- আমি প্রথমত যেটা দেখি, চেষ্টা করি দেখতে ভিজ্যুয়ালি কতটুকু এনগেইজিং ওই স্টোরিটা। আর অথেনটিসিটি অব দ্যা স্টোরি, মানে স্টোরিটা অরিজিনাল কিনা। আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় অনেক ফিকশন ফিল্মও জমা পড়ে এইখানে। ফিকশন ফিল্মটা, আগে ওটা বুঝার চেষ্টা করি যে এইটা কি ফিকশন না ডকু। ফিকশন শুরুতেই বাদ দেই। আমরা ডকুমেন্টারির ক্ষেত্রে প্রধানত দেখতে চেষ্টা করি যে, বোরিং হয়ে যাচ্ছে কিনা। যেমন এইবার একটা সিনেমা জমা পড়েছে, সেটা হচ্ছে একটা দেশের সাহিত্য নিয়ে ডকুমেন্টারি। বড় বড় মিউজিশিয়ান, রাইটার ওরা ইন্টারভিউ দিচ্ছে। মানে ইট'স লাইক এ টকিং হেড। তো এই যে বসা ইন্টারভিউটা, এইটা একেবারে বোরিং হয়ে যাচ্ছে। কারণ, আমাদের ফেস্টিভালের যে ক্রাইটেরিয়া, যে হিউম্যান রাইটস বা লিবারেশন, এইটার মধ্যে পড়ে না এই ফিল্মটা। কাজেই, আমি ওই ফিল্মটাকে আর রাখতে পারছি না আমার সিলেকশনে। আবার এইরকম আরেকটা সিনেমা দেখেছি , তুরস্কের একটা বুক স্টোর নিয়ে। পঞ্চাশ বছর ধরে এই বইয়ের দোকানটা মালিক চালাচ্ছে। কিন্তু আগামী কয়েক বছরের মধ্যে এই দোকানটা ছেড়ে দিতে হবে তার। ফিল্মটা কিন্তু ভিজ্যুয়ালি খুবই এনগেইজিং ছিল।

প্রশ্ন- ফিল্ম সিলেকশনগুলো করতে গিয়ে ব্যতিক্রমধর্মী কোনো ঘটনা কি মনে পড়ছে আপনার?

তানিম ইউসুফ- ব্যতিক্রম ঠিক নয়, তবে অনেক সময় ফিকশন ছবি দেখা হয়ে যায়, যা এই উৎসবের উপযোগী নয়। এমন একটা ইরানি ফিল্মের কথা মনে পড়ছে। যা দেখে আমি নতুন একটা ভাবনায় জড়িয়ে যাই। ছবির মুল চরিত্র, সে একটা সার্চিং করতে থাকে জার্মানিতে, ইরানিয়ান যে মাফিয়া, ড্রাগলর্ড, ওদের খুঁজতে থাকে। খোঁজ করতে করতে দেখা যায়, ফিল্মের শেষে সে নিজেই হচ্ছে অসুস্থ হয়ে পড়ে। তাকে কফির মাধ্যমে জীবানু দিয়ে দেয়া হয়, ক্যান্সারের কার্সিনোজেনিক ম্যাটেরিয়াল পেনট্রেট করা হয় ওর শরীরে। আরো একটা ইরানিয়ান ছবি ছিল, যেখানে দুই ভাই আইসোলেটেড থাকে। পরে সিনেমার শেষের দিকে দেখা যায় ওই দুই ভাই আর নাই। মানে ওদেরকে মেরে ফেলছে বা গুম করে ফেলছে। এরকম খুব ইন্টারেস্টিং স্টোরি ছিল

পোস্টারে শিল্পিত সোনালি দিন

'ফিরে দেখা: সিনেমার গল্প' এ দেশের সিনেমা শিল্প ও ব্যবসার বিবিধ গল্প, যা মূলত দৃশ্যজ সমীকরণের সূত্রে বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্পের স্বর্ণযুগ ও তার বিবর্তনেরও গল্প। কিছু সুনির্দিষ্ট ফ্রেমের মধ্য দিয়ে দেখার ও দেখানোর ভাবনা থেকে এ প্রদর্শনীর সূত্রপাত।

রাজধানীর মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের বার্ষিক আয়োজন 'লিবারেশন ডকফেস্ট'-এর একাদশ আসরের বিশেষ প্রদর্শনী নিয়ে ওপরের কথাগুলো বলছিলেন কিউরেটর মোস্তফা জামান।

'ফিরে দেখা: সিনেমার গল্প'-এ সীমাবদ্ধতা বা মনোযোগের বিস্তার নিয়ে তার মন্তব্য, এ দেশে সিনেমার সার্বিক ইতিহাস তুলে ধরা এ প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য নয়। তবু খণ্ড খণ্ড কিছু দৃশ্যের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাসের মুহূর্তগুলো তুলে ধরে চলচ্চিত্রের ইতিহাসের উর্বর অধ্যায়ের উন্মোচন।

প্রামাণ্যচিত্র নিয়ে দেশের অন্যতম এ উৎসবের এ প্রদর্শনীর মূল আকর্ষণ তিন দশকের পোস্টার, ফটোসেট, বুকলেট, নথি, চলচ্চিত্রবিষয়ক সাময়িকী, আয়োজকদের বিষয়ভিত্তিক লেখা ও ৩৫ মিমি রিলের নিদর্শন।

বাংলা চলচ্চিত্রের সোনালি অতীত নিয়ে প্রশংসনীয় এ আয়োজনে গুরুত্ব পেয়েছে মুক্তি সংগ্রাম ও যাপনের শিল্পিত প্রকাশ। সেই অর্থে অতীত চিনে বর্তমানে দিশা পাওয়ার একটা চেষ্টা রয়েছে।

লক্ষণীয় যে চলচ্চিত্রকে শিল্পনির্ভর বা বাণিজ্যনির্ভর যে ভাগাভাগি আমরা করি না কেন, প্রদর্শিত পোস্টার সেই ব্যবধান কিছু ক্ষেত্রে অনেকটাই উহ্য রেখেছে। তার বদলে গল্প ও তার শিল্পিত রূপই চোখে পড়ে। এখনকার তুলনায় অপ্রতুল প্রযুক্তি নিয়েও কী অসাধারণ সব কাজ করেছেন। একেকটি পোস্টার যেন আলাদা আলাদা দর্শন ও গল্প বলার আকুলতা। প্রদর্শনীর সুবাদে অনেকগুলো পোস্টার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখার পর তা মনে হওয়া স্বাভাবিক।

হাল আমলের কোনো পোস্টার প্রদর্শনীতে না থাকলেও স্বভাবতই তুলনা চলে আসে। বাংলাদেশে ঘরানা অনুযায়ী পোস্টার ডিজাইন এখনো নির্দিষ্ট বর্গে আটকে আছে। অনেক ক্ষেত্রে সহজ ও সাবলীলতা থেকে বেশ দূরে। যতটা না দর্শন বা বিষয়নির্ভর, তার চেয়ে টেকনিকের গরিমা বেশি।

পোস্টার শুধু প্রচারণা উপকরণই নয়, সিনেমার মূল ভাবনাকে তুলে ধরার কাজ করে। ঠিক যেন চিত্রিত মেনিফেস্টো, যার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ বুকলেট। আজকাল শিল্প প্রদর্শনীতে যেমন ক্যাটালগ আমরা দেখি, সিনেমার ক্ষেত্রে বুকলেট তেমনই। যদিও উল্টিয়ে দেখার সুযোগ ছিল না।

প্রদর্শনীতে পোস্টার স্থান পেয়েছে এমন কয়েকটি সিনেমা ওরা ১১ জন, ধীরে বহে মেঘনা, সূর্যদীঘল বাড়ি, দহন, ভাত দে, বসুন্ধরা, আবার তোরা মানুষ হ, ডুমুরের ফুল, সারেং বউ, রংবাজ, লালন ফকির, ঘুড্ডি, এমিলের গোয়েন্দা বাহিনী, সূর্য সংগ্রাম, লাঠিয়াল, পালঙ্ক, সুন্দরী, উৎসব, নোলক, পালঙ্ক, গোলাপী এখন ট্রেনে, অরুণোদয়ের অগ্নিসাক্ষী, আলোর মিছিল, মেঘের অনেক রং, বিন্দু থেকে বৃত্ত, জয় বাংলা, রূপবান, মুখ ও মুখোশ, নয়নমণি, নবাব সিরাজউদ্দৌলা, যে নদী মরু পথে, সুতরাং ও সাত ভাই চম্পা।

শুরুর আলোচনায় ফিরি, চলচ্চিত্র একের মধ্যে অনেক মাধ্যমের সমন্বয়। অনুভূতিজ্ঞাপক যেকোনো কিছুই এর সঙ্গে যুক্ত। বাজার অর্থনীতি ও ঘটমান বাস্তবতার সঙ্গে তার যোগাযোগ থাকে। এক প্রকার ছদ্ম-বাস্তবতা আমাদের

বাস্তব যাপনের সমান্তরালে প্রদর্শিত। সেই অর্থে মানুষ তার সম্ভাবনা ও কল্পনা সমেত চলচ্চিত্রে পাঠ্য।

কোনো একটি সময়ের চলচ্চিত্র আমাদের দেখা না হয়ে উঠলেও পোস্টার দিয়ে অনেক কিছু বিবেচনা করা যায়। একই সঙ্গে কোন স্থানে তা প্রদর্শিত হচ্ছে, সেখানকার নির্বাচন নিয়ে সচেতন থাকার দরকার পড়ে। ডকফেস্টও তার নিজেদের পরিসর স্পষ্ট রেখেছে। সেখান থেকে বাছাই ইতিহাসের পাশাপাশি দৃষ্টিভঙ্গিও ফুটে ওঠে, যা 'দ্য পিকচার' শিরোনামে শিশির ভট্টাচার্য্যের ক্যারিকেচার থেকে বোঝা যাবে। তিনি সিনেমার ক্যানভাসভিত্তিক 'অবক্ষয়ের' চিত্র নিয়ে এসেছেন।

বাস্তবতার সঙ্গে শিল্পভাষার দূরত্ব চিহ্নিত করলেও চলচ্চিত্র কখনো সামাজিক বা রাজনৈতিক পরিসর থেকে আলাদা নয়। সে অর্থে ইতিহাস থেকে বিচ্ছিন্ন করে বর্তমান চলচ্চিত্রের অবস্থা বোঝা যাবে না। সেখান থেকে মনে হতে পারে বিচ্ছিন্ন 'অবক্ষয়' একটা ভুক্তভোগী অবস্থা চিত্রিত করে, কিন্তু তার নির্যাসকে আমরা সমাজ থেকে আলাদা করে দেখছি, যা শিল্পের অতীত গরিমা আকারে দেখা যেতে পারে। যাকে সামগ্রিকভাবে পাঠ না করলে আদতে নতুন কিছু হয়ে ওঠে না।

সিনেমা যে সমাজবিচ্ছিন্ন নয়, তার ব্যাপক উদাহরণ আছে প্রদর্শনীতে। আছে 'স্টপ জেনোসাইড'-এর মতো ঐতিহাসিক দলিল নির্মাণের কথা। তা শুধু চিত্র ও লেখায় সীমাবদ্ধ নয়। এখানকার খুবই কম প্রদর্শনীই স্থিরতায় সীমাবদ্ধ থাকে, সেই দিকটি 'ফিরে দেখা: সিনেমার গল্প'-তেও বিদ্যমান। রয়েছে 'স্টপ জেনোসাইড' পর্দায় দেখার সুযোগ। এ বহুমাত্রিক দেখাদেখির মাঝে সিনেমা যে কতটা জীবনের সঙ্গে যুক্ত তা আমরা বারবার বুঝতে পারি। হয়তো ডকফেস্টের পরবর্তী সংস্করণে এ দেখাদেখির পরিসর বিস্তৃত হবে। সিনেমা ও পোস্টারের বিবর্তনের সুস্পষ্ট দাগগুলো তারা তুলে ধরবেন।

ওয়াহিদ সুজন

(পূনর্মুদ্রিত : বণিকবার্তা থেকে)

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পক্ষে **সারা যাকের**, ট্রাস্টি ও সদস্য সচিব, এফ-১১/এ-বি, সিভিক সেন্টর, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. রেজিনা বেগম
গ্রাফিক্স ডিজাইন : এম আর ইসলাম। ফোন : ৮৮ ০২ ৪৮১১৪৯৯১-৩, ই-মেইল : mukti.jadughar@gmail.com
Web : www.liberationwarmuseumbd.org, Facebook : facebook.com/liberationwarmuseum.official